বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ

বিদ্যার বহু বিস্তীর্ণ ধারার সহিত শিক্ষিত মনের যোগসাধন করিয়া দিবার জন্ত ইংরেজিতে বহু গ্রন্থমালা রচিত হইয়াছে ও হইতেছে। কিন্তু বাংলা ভাষায় এরকম বই বেশি নাই যাহার সাহায্যে অনায়াসে কেহ জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিভাগের সহিত পরিচিত হইতে পারেন। শিক্ষাপদ্ধতির ক্রটি, মানসিক সচেতনতার অভাব বা অন্ত যে-কোনো কারণেই হউক, আমরা অনেকেই স্বকীয় সংকীর্ণ শিক্ষার বাহিরের অধিকাংশ বিষয়ের সহিত সম্পূর্ণ অপরিচিত। বিশেষ, যাঁহারা কেবল বাংলা ভাষাই জানেন তাঁহাদের চিন্তানুশীলনের পথে বাধার অন্ত নাই, ইংরেজি ভাষায় অনধিকারী বলিয়া যুগশিক্ষার সহিত পরিচয়ের পথ তাঁহাদের নিকট রুদ্ধ। আর যাঁহারা ইংরেজি জানেন, স্বভাবতই তাঁহারা ইংরেজি ভাষার দ্বারস্থ হন বলিয়া বাংলা সাহিত্যও সর্বাঙ্গীণ পূর্ণতা লাভ করিতে পারিতেছে না।

যুগশিক্ষার সহিত সাধারণ-মনের যোগসাধন বর্তমান যুগের একটি প্রধান কর্তব্য। বাংলা সাহিত্যকেও এই কর্তব্য পালনে পরাঙ্মুখ হইলে চলিবে না। তাই এই দুর্যোগের মধ্যেও বিশ্বভারতী এই দায়িত্ব গ্রহণে ব্রতী হইয়াছেন।

১৩৫০ সাল হইতে এযাবৎ বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহের মোট ১১৭ খানি পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে। প্রতি গ্রন্থের মূল্য আট আনা। পত্র লিখিলে পূর্ণ তালিকা প্রেরিত হইবে।

বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহের পরিপূরক লোকশিক্ষা গ্রন্থমালার পূর্ণ তালিকা মলাটের তৃতীয় পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য। পত্র লিখিলে বিস্তারিত বিবরণ প্রেরিত হইবে।

হিন্দু আইনে বিবাহ

[illegible]

বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়
২ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট
কলিকাতা

প্রকাশ ১৩৪২ চৈত্র

মূল্য আট আনা

প্রকাশক শ্রীপুলিনবিহারী সেন
বিশ্বভারতী। ৬।৩ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন। কলিকাতা
মুদ্রক শ্রীগোপালচন্দ্র রায়
নাভানা প্রিন্টিং ওআর্কস লিঃ। ৪৭ গণেশচন্দ্র অ্যাভিনিউ। কলিকাতা
৬·১

গোড়াতেই বলে রাখা ভালো, আমাদের আজকালকার হিন্দু আচার-বিচারে হিন্দুয়ানির পরিমাণ, দুধের মধ্যে দুধের ভাগের মতো, যেমন অনেকখানি কমে গিয়েছে তেমনই আমাদের ইদানীন্তন হিন্দু আইনেও হিন্দুত্বের আর বড়ো বেশি কিছু অবশিষ্ট নেই। আমাদের চুক্তির আইন এখন ইণ্ডিয়ান কনট্র্যাক্ট অ্যাক্ট; আমাদের দান-বিক্রি-বন্ধকের আইন এখন ট্রান্সফার অভ্ প্রপার্টি অ্যাক্ট; সাক্ষ্য-প্রমাণের আইন ইণ্ডিয়ান এভিডেন্স অ্যাক্ট; দণ্ডনীতির আইন পাওয়া যাবে ইণ্ডিয়ান পিনাল কোডে। কিন্তু এই সব অ্যাক্ট-কোডের সঙ্গে যাঁদের একটু ভাসা-ভাসা রকমেরও পরিচয় আছে তাঁরা সবাই জানেন যে, এদের ইণ্ডিয়ান নামটা নিতান্ত সৌজন্যের খাতিরে। সোনার জায়গায় যেমন গিল্‌টি, সেই রকম একটা ছলনাময় রূপ মাত্র, স্বরূপ নয়।

কিন্তু আমাদের পারিবারিক আইনে, অর্থাৎ বিবাহ ও উত্তরাধিকারের আইনে, অনেক দিন বিদেশী হাতের প্রলেপ পড়ে নি বলে এদের চেহারা বহু দিন ধরে অবিকৃত অবস্থায় ছিল। মুসলমান রাজপুরুষরা আমাদের ধর্মকর্মের উপর খানিকটা হস্তক্ষেপ করলেও আমাদের পারিবারিক আইন নিয়ে তাঁরা বড়ো মাথা ঘামান নি। ইংরেজ রাজপুরুষরা আমাদের ধর্মকর্মের উপর হাত না দিলেও আমাদের দিশী লোকদের দ্বারাই কৌশলে আমাদের সামাজিক আইনের উপর বেশ-খানিকটা হাত চালিয়ে গেছেন। যার ফলে আমাদের সনাতন হিন্দু আইন এখন জগাখিচুড়ি।

আমাদের এ কালের দিশী স্মৃতিকাররা, অর্থাৎ বিধানসভার সদস্যরা, একে একে এর অনেক-কিছু পরিবর্তন ঘটিয়েছেন। মুখে এঁরা যাই বলুন-না কেন এঁদের মনোভাব এই যে, ইওরোপীয় সমাজ ভারতীয় সমাজের চেয়ে ঢের বেশি উঁচুদরের। সুতরাং ভারতীয় সমাজকে

ইওরোপীয় সমাজের অনুকরণে আগাগোড়া ঢেলে সাজাতে না পারলে আর গতি নেই, প্রগতি তো বহু দূরের কথা। আগেকার দিনে এই মনোভাব শুধু মুখে মুখেই প্রকাশ পেত। কাজে চালু করতে গেলে রাজপুরুষরা নিজেরাই বাধা দিতেন। কিন্তু স্বাধীনতার পর সেটা অত্যন্ত প্রকট হয়েই কাজে দেখা দিয়েছে। কারণ, এখন স্বদেশী বিদেশী বলে তো আলাদা আর কিছু নেই, এখন সবই একাকার। তাই পুরনো স্মৃতির সংস্কার চলেছে আমাদের স্বাধীনতার আমলেই সব চেয়ে বেশি।

এ ছাড়া কালের গতিক বলেও তো একটা জিনিস আছে। এরই ফলে হিন্দুসমাজের অনুষ্ঠেয় দশ-সংস্কারের অনেক সংস্কারই এখন একে একে উঠে গেছে। এমন-কি উপনয়ন-সংস্কারও এখন আর অনেক ব্রাহ্মণকুলের সন্তানের হয় না, ক্ষত্রিয়-বৈশ্যকুলের তো অন্য কথা। গর্ভাধান পুংসবন সীমন্তোন্নয়ন জাতকর্ম নিষ্ক্রামণ চূড়াকরণ প্রভৃতি সংস্কারের কথা জানতে গেলে তো এখন পুরনো পুঁথি খুলে বসতে হয়। নামকরণ ও অন্নপ্রাশন এই দুই সংস্কার এখন এক হয়ে মিশে গিয়ে কোনো ক্রমে টিমটিম করে অনুষ্ঠিত হচ্ছে। কেবল বিবাহসংস্কার আজ পর্যন্ত টিকে আছে; এবং আরো কিছুকাল যে থাকবে, তাই বলে তো বিশ্বাস।

বিবাহ আট প্রকারের। আপনারা হয়তো বাধা দিয়ে আমাকে এইখানেই থামিয়ে দেবার চেষ্টা করবেন। বলবেন, বিবাহ আট প্রকারের? সে আবার কি কথা! আমরা তো বরাবরই জানি, বিবাহ মাত্র এক প্রকারের। বর টোপর মাথায় দিয়ে কনের বাড়ি বিয়ে করতে যায়। সেখানে পুরুতঠাকুর দুটো মন্ত্র পড়ান। তার পর কনের বাপ বর-কনের দু-হাত এক করে কন্যা সম্প্রদান করে ছেড়ে দিলেই তো বিয়ে হয়ে গেল! এর মধ্যে আবার প্রকারভেদ কি আছে? তবে

বিবাহের আনুষঙ্গিক খাওয়া-দাওয়া সাজ-সজ্জা, দান-সামগ্রী, গহনা-গাঁটি বিদায়-আদায় দেয়-দক্ষিণা—এই সবে রকমভেদ খানিক আছে বৈ কি ? সেটা অবশ্য অস্বীকার করা যায় না।

তা হলে শুনুন, মনু কি বলেছেন। আপনারা আর কাউকে না মানলেও মনু-মহারাজকে তো মানতেই হবে। কারণ শাস্ত্র বলেছেন, অন্য কারো কথার সঙ্গে যদি মনুর বচনের বিরোধ ঘটে তা হলে মনুর বিধানই শিরোধার্য, যেহেতু মনুর বাক্য অমৃত-সমান। বৃহস্পতি মুনি তো স্পষ্টই অঙ্গীকার করেছেন : মন্বর্থবিপরীতা যা সা স্মৃতি র্ন প্রশস্যতে, অর্থাৎ মনুর বিরুদ্ধ যে স্মৃতি, সে স্মৃতি মোটেই কোনো কাজের স্মৃতি নয়।

মনু বলছেন :

ব্রাহ্মো দৈবস্তথৈবার্ষঃ প্রাজাপত্যস্তথাসুরঃ।
গান্ধর্বো রাক্ষসশ্চৈব পৈশাচশ্চ অষ্টমোঽধমঃ॥

—মনুসংহিতা, ৩য় অধ্যায়, ২১ শ্লোক

ব্রাহ্ম দৈব আর্ষ প্রাজাপত্য আসুর গান্ধর্ব রাক্ষস এবং সর্বাধম পৈশাচ —বিবাহ এই আট প্রকারের।

কিন্তু মেধাতিথি ও কুল্লূকভট্ট, মনুসংহিতার দুজন প্রধান টীকাকার, একবাক্যে বলেছেন, প্রথম চার রকমের বিবাহ প্রশস্ত, বাকি চারটি নিকৃষ্ট। মনু নিজেও বলেছেন :

পৈশাচশ্চাসুরশ্চৈব ন কর্তব্যৌ কদাচন

অর্থাৎ আসুর ও পৈশাচ বিবাহ করা কখনই কর্তব্য নয়।

নাম দেখেই অনুমান হয়, শেষের চার প্রকার বিবাহ, অর্থাৎ আসুর গান্ধর্ব রাক্ষস ও পৈশাচ, পুরাকালের অনার্যদের মধ্যেই প্রচলিত বিবাহ। ব্রাহ্মণ্যসমাজ তাঁদের স্মৃতির গ্রন্থে এদের স্থান দিলেও মন থেকে কখনই তাদের ভালোভাবে গ্রহণ করেন নি।

আপনারা যদি মনে করেন যে এই আটরকমের সবক'টা বিবাহই এখনো প্রচলিত আছে তা হলে অত্যন্ত ভ্রমে পড়বেন। এবং এই ভ্রমবশতঃ যদি কেউ নিজের সম্বন্ধে সেটা পরখ করে দেখবার চেষ্টা করেন তা হলে আগের থেকেই সাবধান করে দিচ্ছি, বিপদে পড়বেন। কারণ, তা করতে গেলে পিনাল কোড বলে যে আর-একটা শাস্ত্র আছে, তারই কবলে পড়ে যাবেন। তার বিধান স্মৃতিশাস্ত্রের সূত্রগুলোর চেয়ে ঢের বেশি কঠিন। স্মৃতিশাস্ত্রকে তবু বরং অগ্রাহ্য করা যায়, কিন্তু পিনাল কোডের ধারাগুলোকে কোনোক্রমেই অমান্য করতে পারা যায় না।

আজকাল ভদ্রসমাজে হিন্দু আইন অনুসারে ব্রাহ্ম বিবাহই প্রকৃষ্ট, এবং তাই সাধারণতঃ হিন্দুসমাজে অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। ব্রাহ্ম নাম শুনেই যেন হঠাৎ মনে করে বসবেন না যে, ব্রাহ্মসমাজে যে পদ্ধতিতে বিবাহ হয়, এ সেই বিবাহ। তা নয়। ব্রাহ্মণ্য-আচার-সম্পৃত বিবাহের নামই ব্রাহ্ম বিবাহ। শিক্ষিত ও ভদ্র বরকে সমাদরে আহ্বান করে এনে তাঁকে উপযুক্ত দক্ষিণাদি দিয়ে অর্চনা করে, তাঁর হাতে বস্ত্রালংকারে সুসজ্জিত কন্যাকে সম্প্রদান করার নামই ব্রাহ্ম বিবাহ। মর্যাদাসূচক এই উপযুক্ত দক্ষিণা দেওয়ার রীতি কালক্রমে কদর্য পণ-প্রথায় গিয়ে দাঁড়িয়েছে।

হিন্দুসমাজের নিম্নস্তরে কিন্তু আসুর বিবাহের এখনো বেশ চল আছে। আসুর বিবাহের সোজা বাংলা মানে, পয়সা দিয়ে কনে কেনা। যে শ্রেণীর লোকেরা শারীরিক পরিশ্রমের দ্বারা জীবিকা অর্জন করেন, তাঁদেরই আমরা সাধারণতঃ নিম্নশ্রেণীর পর্যায়ে ফেলে থাকি। আশ্চর্য এই যে, এই শ্রেণীর সমাজে সন্তান জন্মায় প্রচুর পরিমাণে। আর, মেয়ের চেয়ে ছেলে জন্মায় আরো ঢের বেশি। চাহিদার সঙ্গে জোগানের পরিমাণের অনুপাত কষেই দাম স্থির হয়, এ কথা পণ্ডিত

ব্যক্তিরা বলে থাকেন। সুতরাং এই সমাজে দাম দিয়ে কনে সংগ্রহ তো করতেই হবে। তা ছাড়া এই সমাজের মেয়েরা শারীরিক পরিশ্রমের দ্বারা অর্থ উপার্জন করে পরিবারের আয় বৃদ্ধি করেন; সুতরাং দাম তো তাদের একটা নিশ্চয়ই থাকবে। এক সময় রাঢ় দেশে অকুলীন নীচু ব্রাহ্মণদের পক্ষে বিয়ের জন্যে কনে পাওয়া দায় ছিল। সুতরাং তাঁদেরও পয়সা দিয়ে শ্রোত্রিয় ঘরের কন্যা সংগ্রহ করতে হত। আজকালকার সমাজে অবশ্য উঁচুনীচুর ব্যবধান খুবই কম। তাই একে একে এসব প্রথা এখন চলে যাচ্ছে। তবে একেবারে যে উঠে গেছে, তা বলা যায় না।

আচার-অনুষ্ঠানের কোনো বালাই নেই এমন যে স্রেফ প্রণয়মূলক বিবাহ, তারই নাম হচ্ছে গান্ধর্ব বিবাহ। পুরাকালে স্থানে অস্থানে এই বিবাহের নিদর্শন পাওয়া গেলেও এখন এ বিবাহ সম্পূর্ণভাবে অবৈধ। রেজিস্ট্রি করে তাকে শুদ্ধ করে নিতে হয়। নতুবা পিনাল কোড আছে। তবে আচারবিচারহীন রেজিস্ট্রি বিয়েই যে এক রকম গান্ধর্ব বিবাহ কিনা, সে কথাও ভেবে দেখবার বিষয়।

প্রাচীনকালে ঋষিদের বিবাহের নাম ছিল আর্য বিবাহ। এই বিবাহে হোমের ঘি তৈরির জন্য কনের বাপকে বর এক জোড়া গো-মিথুন উপহার দিতেন। আধুনিক কালের ভদ্রসমাজে বিবাহে যা-কিছু প্রাপ্য, তা বরের বাপেরই। কনের বাপ তো এই সময় ঠিক যেন চোর-দায়ে ধরা পড়েছেন, এইভাবে সর্বক্ষণ কাঁচুমাচু হয়ে থাকেন।

বলপূর্বক কন্যাহরণের দ্বারা স্ত্রী-সংগ্রহের নাম রাক্ষস বিবাহ। প্রাচীনকালের ক্ষত্রিয়েরা এসব কাণ্ড বিস্তর করেছেন। এক মহাভারতেই তার অসংখ্য প্রমাণ আছে। কিন্তু এও এখন পিনাল কোডের বিশেষ বিশেষ ধারায় গিয়ে পড়ে।

অজ্ঞান কিংবা উন্মত্ত অবস্থায় আচ্ছন্ন, কিংবা ঘুমন্ত কি নেশায় বিভ্রান্ত কন্যাকে হরণ করে, জোর করে সেই কন্যাতে উপগত হওয়া, কিংবা কোনো রকম ছলনার দ্বারা কন্যাকে বিবাহ করাকে পৈশাচ বিবাহ আখ্যা দেওয়া হত। এখানেও পিনাল কোড তার খাঁড়া উঁচিয়ে আছে।

যজ্ঞের ঋত্বিক্‌কে দক্ষিণা হিসেবে কন্যাদানের নাম দৈব বিবাহ। আজকাল বৈদিক যজ্ঞও নেই, খাঁটি ঋত্বিক্‌ও নেই। সুতরাং এ বিবাহও এখন অপ্রচলিত। পুরোহিতরা সমাজে আছেন বটে; কিন্তু তাঁরা কন্যার বদলে কাঞ্চন কিংবা কাঞ্চনমূল্য দক্ষিণা পেলে ঢের বেশি খুশি হবেন বলেই মনে করি।

'তোমরা উভয়ে সম্মিলিত হয়ে ধর্মাচরণ কর'—এই রকম এক উপদেশ দিয়ে বরের হাতে কন্যাসম্প্রদান করার নাম প্রাজাপত্য বিবাহ। বর্তমান সমাজে ফাঁকা ধর্মকথায় খুশি হবার মতো বর তো কোথাও দেখা যায় না। সুতরাং এই বিবাহও এখন অপ্রচলিত বিবাহের পর্যায়ে পড়ে।

এই আট প্রকার বিবাহের কথা আরো বিশদ ভাবে জানবার ইচ্ছা থাকলে মনুসংহিতার তৃতীয় অধ্যায় একবার পড়ে দেখতে পারেন। সেখানে এদের বিস্তারিত বর্ণনা পাওয়া যাবে।

কিন্তু এ তো গেল সব শাস্ত্রের কথা। এ দেশে এমন অনেক রকমের বিবাহপ্রথা আছে যাদের হদিশ কোনো শাস্ত্রেই পাওয়া যায় না। কিন্তু অশাস্ত্রীয় হলেও সেগুলো অবৈধ নয়। কারণ, যেসব প্রথা বহুকাল ধরে আচরিত হয়ে আসছে সেগুলো দণ্ডনীতির বিরুদ্ধে না গেলে, তাদের আইনসংগত বলেই মেনে নিতে হয়। এ ক্ষেত্রে শাস্ত্রেরই এক বচন প্রমাণ :

বচনশতেনাপি বস্তুনোঽন্যথাকরণাশক্তে

অর্থাৎ শত শত শাস্ত্রবাক্য আউড়িয়েও বস্তুর বস্তুত্ব ঘোচানো যায় না। এটা বলেছেন দায়ভাগ-গ্রন্থকর্তা জীমূতবাহন, বিখ্যাত বাঙালী স্মৃতিকার। একটা সংস্কৃত উদ্ভট্ শ্লোকে কিন্তু আরো পরিষ্কার ব্যাখ্যা পাওয়া যায়:

> ন দোষো মগধে মন্তে অন্নযোনৌ কলিঙ্গকে।
> ওড্রে ভ্রাতৃবধূভোগে গৌড়ে মৎসস্থ ভক্ষণে॥
> দুহিতুর্মাতুলস্যাপি বিবাহে কেরলে তথা।
> যস্মিন্ দেশে যদাচারঃ পারম্পর্যং বিধীয়তে॥

অর্থাৎ মগধদেশে মদ্যপান কিছু দোষের নয়। কলিঙ্গদেশে অন্নগ্রহণ বা গম্যাগম্য সম্বন্ধে যে বাছ-বিচার নেই, তাতে দোষ হয় না। উৎকলে ভ্রাতৃবধূকে বিবাহ করা দোষের নয়। বঙ্গদেশে মৎস্যাহারে দোষ নেই। সেই রকম, কেরল দেশে মাতুলকন্যা বিবাহতেও কোনো দোষ হয় না। যে দেশে যেমন আচার পরম্পরাক্রমে চলে আসছে, সে দেশে সেই আচারই বৈধ।

বিভিন্ন প্রকারের সব অশাস্ত্রীয় অথচ বৈধ বিবাহপ্রথার ফিরিস্তি দিতে গেলে পুঁথি বেড়ে যাবে। নমুনা হিসেবে দু-চারটে উল্লেখ করছি মাত্র।

প্রথমে রাজরাজড়ার ঘরে সন্ধান নেওয়া যাক। ত্রিপুরার স্বাধীন রাজাদের ঘরে 'শান্তিগৃহীতা' বলে একরকম বিবাহ প্রচলিত আছে। দেবী ত্রিপুরেশ্বরীর বিগ্রহের সামনে পুজো দিয়ে তার শান্তিজল মাথায় ছিটিয়ে দিলেই বিয়ে হয়ে গেল। উড়িষ্যার অনেক সামন্ত রাজপরিবারে শুধু মালাবদল করে 'ফুলবিয়া' চলে। মানভূম অঞ্চলের প্রধানদের মধ্যে সাঁওতালদের মতো শুধু কনের সিঁথিতে খানিক সিঁদুর ছুঁইয়ে দিয়ে 'সিন্দুরদান' বিবাহ প্রচলিত আছে। রাজপুতানার এবং দাক্ষিণাত্যের অনেক ঘরানা ঘরের বর পদাভিমানবশতঃ বিয়ে করতে

নিজে কনের বাড়ি যান না, প্রতিনিধি হিসেবে তলোয়ার কি কাটারি পাঠিয়ে দেন; তারই সঙ্গে কন্যার বিবাহকর্ম সমাধা করা হয়।

সামান্য ঘরেও এরকম অনেক আছে। কামাখ্যায় শুধু পান বদল করে বিবাহপ্রথা আছে। বাংলার বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের মধ্যে 'কণ্ঠিবদল' বিবাহ দেখতে পাওয়া যায়। সমাজের নিম্নস্তরের লোকেদের মধ্যে সম্পূর্ণভাবে আচার-অনুষ্ঠান বিবর্জিত 'সাগাই' কিংবা 'সাঙ্গাইত' কি 'সাঙা' বিবাহ বাংলাদেশে আসামে ও উত্তরপ্রদেশে প্রচলিত আছে। আদিবাসী ও উপজাতিদের মধ্যে অনেক জায়গায় প্রথমে গাছের সঙ্গে ফুলের সঙ্গে পশুপক্ষীর সঙ্গে কি গ্রহ-উপগ্রহের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দেবার পর তবে মানুষের সঙ্গে বিয়ে দেওয়া হয়, যাতে হঠাৎ বিয়েতে কারো নজর না লাগে।

এ ছাড়া ভারতবর্ষের অনেক অঞ্চলে, বিশেষতঃ দক্ষিণ অঞ্চলে, এমন-সব অশাস্ত্রীয় বিবাহ আছে যাদের কথা ভদ্রসমাজে প্রকাশ করলে, ভদ্রব্যক্তিরা ভয় পেয়ে আঁতকে উঠতে পারেন।

বাংলাদেশের তান্ত্রিকদের মধ্যে এক অশাস্ত্রীয় বিবাহ আছে, যার নাম শৈব বিবাহ। শৈব বিবাহ ঠিক সামাজিক বিবাহ নয়, তন্ত্রমতে সাধনচক্রের গুপ্ত বিবাহ। এই গুপ্ত বিষয়কে ব্যক্ত করা উচিত কাজ হবে না; তাই প্রকাশ্যে শুধু এইটুকুই বলা যেতে পারে, এ বিবাহে বর্ণ গোত্র শ্রেণী এমন-কি বয়সেরও কোনো বাছ-বিচার নেই। শুধু দুটি নিয়ম মানবার আছে। স্বামী বর্তমান থাকতে কোনো স্ত্রীলোকের শৈব বিবাহ হতে পারে না, আর সপিণ্ড অর্থাৎ নিকট-আত্মীয়ের মধ্যে এ বিবাহ চলে না।

এইসব অশাস্ত্রীয় বিবাহের কথা স্মৃতিশাস্ত্রে স্থান না পেলেও মোটা মোটা ল রিপোর্টে জজেদের রায়ের অনেকটা জায়গা জুড়ে বসে আছে।

স্মৃতিশাস্ত্রের বিবাহপ্রকরণে বিধির চেয়ে নিষেধই বেশি। সকলের সঙ্গে সকলের যে বিবাহ হয় না, এ তো সকলেরই জানা কথা। কার সঙ্গে কার বিবাহ হতে পারে না, তাই নিয়ে স্মৃতিকাররা ঢের বেশি চিন্তা করেছেন। অথচ পুরাকালে, অর্থাৎ বৈদিক যুগে, বৈধ-অবৈধ নিয়ে এত মারকাট ছিল না। স্মৃতিশাস্ত্রেরও তখনো প্রয়োজন হয় নি। তাই বিবাহ-ব্যাপারেও বিশেষ কোনো বাঁধাবাঁধি ছিল না। সমাজ তখনো ভালো করে দানা বাঁধে নি। প্রবল প্রাণের বেগে চলন্ত সেই সমাজ সব বাধা-বিপত্তি বিধি-নিষেধ অতি সহজেই ডিঙিয়ে পার হয়ে গেছে। তখন প্রসারের যুগ। তাই আর্য-অনার্য-বিবাহ অসবর্ণ-বিবাহ সপিণ্ড-বিবাহ সগোত্র-বিবাহ বিধবা-বিবাহ বড়ো বয়সে বিবাহ ইত্যাদি, পরবর্তী কালের অনেক নিষিদ্ধ বিবাহ, সে সময়ে অবাধে সমাজে চলে গেছে। কেউ তা নিয়ে কোনো ঘোঁট তোলেন নি। তা ছাড়া আর্য পিতামহেরা তো বিবাহ জিনিসটার একটা গুরুতর আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা দিয়ে তাকে একটা ঘোরতর দুরূহ ব্যাপার কখনো করে তোলেন নি। তাঁরা বিবাহকে এক স্বাভাবিক প্রবৃত্তি চরিতার্থ করার ও প্রজাবৃদ্ধি করার একটা বৈধ উপায় বলেই ধরে নিয়েছিলেন।

ক্রমশ আর্য পিতামহেরা দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়ে একটা বিস্তৃত সমাজের সৃষ্টি করলেন। পরবর্তী ব্রাহ্মণ্যযুগেই বিবাহ একটা সংস্কার বলে গণ্য হল, এবং তারই সঙ্গে এল বিবাহের নানা রকম আচার-অনুষ্ঠান। কড়া নিয়ম-কানুনের সৃষ্টি হয় আরো খানিক পরে। তখন স্মৃতি-শাস্ত্রের সূত্রগুলো দিয়ে সমাজকে আষ্টে-পৃষ্ঠে বাঁধা হল। সে সূত্রগুলো আদবেই মৃণালসূত্রের মতো কোমল নয়, লোহার দড়ির মতোই কঠোর কঠিন। তাইতেই তো স্মৃতিশাস্ত্র বিধি-নিষেধে এতো ভারী হয়ে উঠেছে।

সমাজ ক্রমশ বড়ো হয়ে উঠতে সংরক্ষণের যুগ এল। সংরক্ষণ করতে গেলেই সমাজের চার পাশে এক-একটি গণ্ডীর রেখা টানতে হয়; এবং সেই সঙ্গে বিভিন্ন শ্রেণীবিভাগেরও দরকার হয়ে পড়ে। কারণ, নানা রকম বিচিত্র লোককে একত্র করেই তো সমাজ। আর লোকসৃষ্টি তো বিবাহেরই ফল। সুতরাং বিবাহ-ব্যাপারে যে বেশ খানিক বিধিনিষেধের আমদানি হবে, তাতে আর আশ্চর্য কি? এই সঙ্গে স্মৃতিকাররা একটু কৌশল খেললেন। বৈদিক যুগের যেসব উদার আচার-ব্যবহার ছিল সে সম্বন্ধে স্মৃতিকাররা সোজাসুজি বলে বসলেন, 'এখন কলিযুগ, এ যুগে আর ওসব কিছু চলবে না।'

হিন্দু আইনের প্রথম কথা, হিন্দু পাত্রের সঙ্গে হিন্দু পাত্রীর বিবাহই হল হিন্দু বিবাহ। হিন্দুর সঙ্গে অহিন্দুর বিবাহ যে হিন্দু বিবাহ নয়, সে কথা বোধ করি কাউকে খুলে বলে দিতে হবে না। তবে হিন্দু যে কে, তা নিয়ে অনেক তর্কবিবাদ আছে। হিন্দু যে কে নয়, সেটা আমরা বেশ জানি। কিন্তু হিন্দু যে কে, তার ব্যাখ্যা করতে গেলেই বিপদে পড়ি। আমি ইচ্ছে করে সে বিপদ টেনে আনতে চাই নে বলে ও-বিষয়ে আর কিছু উচ্চবাচ্য করছি না। শুধু একটা কথা বলে রাখি, হিন্দু নামটা এ দেশীয় নয়। বেশি প্রাচীনও নয়, খুবই অর্বাচীন। মুসলমানরা প্রথমে সিন্ধুনদের এপারের লোকদের হিন্দু নামে অভিহিত করতে থাকেন। কালক্রমে যখন এ দেশে মুসলমান রাজত্ব কায়েম হল তখন অমুসলমান ভারতবাসীদের সংজ্ঞা হিসাবে হিন্দু নামটি চালু হয়ে গেল। এখনো ইওরোপের কন্টিনেন্টে ও অ্যামেরিকায় সমস্ত ভারতবাসীই হিন্দু নামে পরিচিত, ধর্ম তাঁদের যাই হোক-না কেন।

হিন্দু বিবাহে প্রথম নিষেধ অসবর্ণ-বিবাহ। গোড়ায়, অর্থাৎ বৈদিক যুগে, বর্ণ মাত্র দুটি ছিল। সাদা আর কালো। আর্য ও অনার্য।

ধলো রঙের লোকের কালা আদমির উপর চিরকালের অবজ্ঞা। কিন্তু আর্যপিতামহেরা যখন ঘুরতে ঘুরতে এ দেশে এসে পড়েছিলেন তখন সঙ্গে বেশি স্ত্রীলোক আনেন নি। সেইজন্য এ দেশে আসার পর তাঁদের বাধ্য হয়েই মেঘবর্ণের কন্যা সংগ্রহ করতে হয়েছিল—পণ্ডিত ব্যক্তিরা এই রকম একটা কথা বলে থাকেন। বোধ হয় এই অবস্থায় পড়ে একটু একাকার হবার সম্ভাবনা ঘটেছিল, খানিক স্বৈরাচারও বোধ করি সমাজে দেখা দিয়েছিল।

তাই মহাভারতে পাওয়া যায়, উদ্দালক মুনির ছেলে শ্বেতকেতু ভারতবর্ষে প্রথম বর্ণবিভাগ করে তারই উপর ভারতীয় সমাজকে প্রতিষ্ঠিত করলেন। কথাটাকে নিছক আখ্যায়িকা বলে উড়িয়ে না দিলে তার থেকে এই ধারণা হয় যে, ভারতীয় সমাজ যে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র এই চার বর্ণে বিভক্ত হল, সেটা একটা পরিষ্কার চেহারা নিয়েছিল বৈদিক যুগের কিছুকাল পরে। কিন্তু ক্রমশ চেহারাটা এতই সুস্পষ্ট হয়ে উঠতে লাগল যে, সেই তখন থেকে এখন পর্যন্ত ওই একই বর্ণবিভাগের পরিচয় আমরা পদে পদে পেয়ে আসছি। এই সঙ্গে আর-একটা কথাও শোনা যায় যে, শ্বেতকেতুই নাকি প্রথম ভারতবর্ষে বিবাহপ্রথারও প্রবর্তন করেন। এর মানে বোধ হয় এই যে, সমাজে স্বৈরাচারের প্রাবল্য দেখে তিনিই সম্ভবতঃ প্রথম বিবাহব্যাপারে নানাপ্রকার ভেদাভেদ বিধিনিষেধ এনে ফেলে যত-সব কড়াক্কড়ির সৃষ্টি করেন।

তবে ওর মধ্যে একটু কথা আছে। বাংলাদেশ চিরকালই কেমন যেন একটু সৃষ্টিছাড়া। বাঙালীরা বরাবরই একটু স্বতন্ত্রভাবে নিজেদের মতো করে নিজেদের চালাবার চেষ্টা করেছে। তাই বাংলা মুল্লুকের আচারব্যবহার খাওয়াপরা সমাজবিন্যাস পূজাপার্বণ এমন-কি দেবদেবী সবই, বাকি ভারতবর্ষের থেকে কিছু-না-কিছু তফাত। তাই বাংলা-

দেশের আইনও ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশের আইনের চেয়ে অনেকটা অন্য রকমের।

স্মার্ত ভট্টাচার্য রঘুনন্দন বাঙালী সমাজের বর্ণবিভাগ করেছেন দুই ভাগে। কতকটা বৈদিক আমলের মতোই— ব্রাহ্মণ আর শূদ্রে। বাঙালী কায়স্থরা নিজেদের ক্ষত্রিয়, বাঙালী বৈদ্যরা নিজেদের ব্রাহ্মণ, এবং কৃষিজীবী ও অন্যান্য কারিগর সম্প্রদায়ের অনেকে নিজেদের বৈশ্য বলে দাবি করলেও স্মার্ত ভট্টাচার্যের মতে তাঁরা সবাই শূদ্র। এবং সেই কারণে আজকালকার বাংলাদেশের আইনের চোখেও ওই দুই-এর বেশি তৃতীয় আর কোনো বর্ণ নেই। স্মার্ত ভট্টাচার্য অবশ্য স্মৃতিকারদের মধ্যে একেবারে অর্বাচীন— মাত্র পনেরো শতাব্দীর লোক।

স্মৃতিকারদের সময় সবর্ণ বিবাহই প্রশস্ত বিবাহ বলে গণ্য হলেও অসবর্ণ বিবাহ যে একেবারে নিষিদ্ধ হয়ে গিয়েছিল, তা অবশ্য নয়। তবে প্রথম বিবাহ সবর্ণে করে তার পর অসবর্ণ বিবাহ করতে পারা যেত, এইটেই ছিল বিধি। কিন্তু স্মৃতিকারদের সবর্ণ বিবাহের দিকে একটু বেশি রকমের টান ছিল বলে তাঁরা বলেছেন, বৈবাহিক হোমের সময় সবর্ণ কন্যাদেরই একমাত্র বরের পাণিগ্রহণ করার অধিকার। অন্য বর্ণের কন্যা হলে তাঁরা যথাক্রমে বর্ণ অনুসারে বরের শর কি লাঠি কি উত্তরীয়ের কোণ ধরবেন।

অসবর্ণ বিবাহ একেবারে নিষিদ্ধ না হলেও প্রতিলোম বিবাহ যে নিষিদ্ধ ছিল, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। অনুলোম বিবাহই বৈধ বিবাহ ছিল। অর্থাৎ ব্রাহ্মণ বর্ণের বর, অপর তিন বর্ণের অর্থাৎ ক্ষত্রিয়-বৈশ্য- এবং কচিৎ শূদ্র-কন্যা বিবাহ করতে পারতেন। ক্ষত্রিয় বর বৈশ্য- ও শূদ্র-কন্যা, এবং বৈশ্য বর শূদ্র-কন্যা গ্রহণ করতে পারতেন। কিন্তু উলটোটা চলত না। অর্থাৎ শূদ্র বরের পক্ষে ব্রাহ্মণ- ক্ষত্রিয়- কি

বৈশ্যকন্যা বিবাহ করা শুধু নিষিদ্ধ নয়, শেষপর্যন্ত দণ্ডনীয়ও হয়ে দাঁড়িয়েছিল। তেমনই, বৈশ্যের পক্ষে ব্রাহ্মণ- ও ক্ষত্রিয়-কন্যা, ক্ষত্রিয়ের পক্ষে ব্রাহ্মণ-কন্যা বিবাহ নিষিদ্ধ।

তবে বিধি থাকলে কি হয়, অনুলোম বিবাহ ব্রাহ্মণ্যসমাজে খুবই দৃষ্টিকটু ছিল। অনুলোম বিবাহের সন্তানদের সমাজে বেশ একটু হেয় হয়েই থাকতে হত। অনেক স্থানে দেখা যাচ্ছে, তাদের নীচোদ্ভব বলে অবজ্ঞা করা হচ্ছে, সামাজিক পংক্তিভোজন থেকে তাদের বাদ দেওয়া হচ্ছে; এমন-কি মৃত পিতার পরিত্যক্ত সম্পত্তি ভাগের সময় অসবর্ণ বিবাহের পুত্ররা সবর্ণ বিবাহের পুত্রদের চেয়ে অংশে কম পাচ্ছেন।

এই রকম চলতে চলতে এক সময় অসবর্ণ বিবাহ একেবারেই বন্ধ হয়ে যায়—তা সে কি অনুলোম আর কি প্রতিলোম। কিন্তু এই ব্যাপারটা ঠিক যে কখন ঘটল, তা নিশ্চিত বলা শক্ত। অর্বাচীন টীকা ও নিবন্ধগ্রন্থগুলোতে স্পষ্ট করে লেখা আছে, পূর্বে যা হয়ে গেছে তা গেছে, এখন আর অসবর্ণ বিবাহ মোটেই চলবে না।

কিন্তু বাংলাদেশে শুধু দুই বর্ণ থাকার দরুণ শূদ্রবর্ণের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে বিবাহ আইনের চোখে অসিদ্ধ নয়। ল রিপোর্টগুলো নিয়ে একটু ঘাঁটলেই দেখা যাবে, বঙ্গদেশে কায়স্থের সঙ্গে ডোমের, কায়স্থের সঙ্গে শুঁড়ির, কায়স্থের সঙ্গে তাঁতির, কায়স্থের সঙ্গে বৈদ্যের ইত্যাদি নানা প্রকারের বিচিত্র বিবাহ, সমাজে দৃষ্টিকটু হলেও বেআইনী নয় বলেই ধার্য হয়ে গেছে।

সবর্ণ বিবাহ প্রসঙ্গেই আরো দুটো বাধার কথা ওঠে। স্বশ্রেণীতে বিবাহ এবং কৌলীন্যপ্রথা। তবে এ দুটো বাধা সামাজিক বাধা মাত্র, কোনোটাই আইনের বাধা নয়। অর্থাৎ বিবাহে শ্রেণীভঙ্গ বা কুলভঙ্গ

করলে সামাজিক দোষ ঘটে, কিন্তু আইনের চোখে সে বিবাহ অসিদ্ধ বিবাহ হয়ে পড়ে না।

বাংলাদেশের ব্রাহ্মণকুলে তিন শ্রেণী—রাঢ়ী বারেন্দ্র ও বৈদিক। বৈদিকদের মধ্যেও আবার দুই শ্রেণী—পাশ্চাত্য ও দাক্ষিণাত্য। এক সময় এমন ছিল যে, এইসব বিভিন্ন শ্রেণীর ব্রাহ্মণের মধ্যে করণকারণ তো বহু দূরের কথা, পরস্পরের বাড়িতে আহারাদি করাও এক মহা অসামাজিক এবং অশিষ্ট কাণ্ড বলে গণ্য হত। অত্যন্ত গোঁড়াদের মধ্যে শ্রেণীগত সামাজিক বাধা নিয়ে এখনো একটু খুঁতখুঁতোনি থাকলেও সাধারণের মন থেকে এই বাধাটা এখন সম্পূর্ণভাবে চলে গেছে বললে অত্যুক্তি হয় না।

কায়স্থদের মধ্যেও শ্রেণী বিভাগ আছে। রাঢ়ী দু-রকমের— উত্তর ও দক্ষিণ রাঢ়ী। তার পর বারেন্দ্র ও বঙ্গজ।

অন্যান্য সম্প্রদায়ের মধ্যেও শ্রেণীবিভাগ আছে বটে, তবে ব্রাহ্মণ ও কায়স্থদের মতো অতটা উৎকট নয়। এক সময় রাঢ়ী বৈদ্যের সঙ্গে পূর্বদেশের বৈদ্যের বিবাহ হত না। তার কারণ বোধ হয়, পূর্বাঞ্চলের বৈদ্যেরা তখন উপবীত গ্রহণ করতেন না।

কৌলীন্যপ্রথার চাপ বাংলাদেশে এক সময় বড়ো বেশিই ছিল। বাংলায় কৌলীন্যপ্রথা রাজা বল্লাল সেন প্রবর্তন করেন, এ কথা সকলেরই জানা আছে। কিন্তু আমার মনে হয়, প্রথাটাকে ভালো করে বাঙালী সমাজের ঘাড়ে চাপানোর মধ্যে স্মার্ত রঘুনন্দন ভট্টাচার্যের যথেষ্ট হাত ছিল। ব্রাহ্মণদের মধ্যে রাঢ়ী ব্রাহ্মণরা পাঁচ বংশ, বারেন্দ্র ব্রাহ্মণরাও পাঁচ কুলীন। এককালে এঁদের শুধু উপাধি ধরেই চিনতে পারা যেত যে তাঁরা কুলীন কি না। কারণ, তখন কুলভঙ্গ হয়ে পাঁচ পুরুষ গেলেই কৌলিক উপাধি বদলে ফেলতে হত।

কায়স্থদের মধ্যে তিন কুলীন— ঘোষ বসু মিত্র। পূর্বাঞ্চলে গুহ-বংশও কুলীন। অন্যান্য শ্রেণীর লোকেরা ব্রাহ্মণ-কায়স্থদের দেখাদেখি কৌলীন্য দাবি করেন বটে, কিন্তু তাঁদের কৌলীন্য ঠিক বল্লালসেনীয় কৌলীন্য নয়, সে এক মনগড়া উঁচুনীচুর কৌলীন্য।

ব্রাহ্মণসমাজে কন্যাগত কুল। অর্থাৎ সবক'টি কন্যাকে কুলীনে পাত্রস্থ না করতে পারলে কন্যার পিতৃকুলের কুলভঙ্গ হয়। কায়স্থদের কিন্তু এ বিষয়ে যথেষ্ট সুবিধা আছে। তাঁদের পুত্রগত কুল। অর্থাৎ বড়ো ছেলে কুলীনকন্যা বিবাহ করলেই কুলরক্ষা হয়ে গেল। ব্রাহ্মণ-গোষ্ঠীর দু-চার বংশ এখনো নিজেদের নিকষ কুলীন বলে গর্ব করতে থাকলেও বিবাহে কৌলীন্যপ্রথার বাধা উঠে গেছে। কারণ, আজকালকার সমাজ অর্থতন্ত্রের উপর প্রতিষ্ঠিত। পয়সাই এখন কৌলীন্যের মর্যাদা এনে দেয়।

এসবের উপর আবার নুলো পঞ্চানন ও দেবীবর ঘটক মিলে কুলীন ব্রাহ্মণদের মধ্যে মেলবন্ধন থাক্ ও পটিবন্ধন করে দিয়ে, বিবাহে আরো একটা সামাজিক বাধার সৃষ্টি করেছিলেন। যদিও এসব বন্ধনের কথা শুনে আজকালকার লোকেরা হাসবেন তবু এইসব বন্ধনের মধ্যে অনেক অশাস্ত্রীয় ও অসামাজিক বিবাহের ইতিহাস নিবদ্ধ হয়ে আছে।

বর্ণ ছাড়া আরো গোটাকতক আইনের বড়ো বাধা হিন্দুদের বিবাহ-ক্ষেত্রে আছে। তা হচ্ছে, গোত্র ও প্রবরের বাধা। একই গোত্র ও একই প্রবরের মধ্যে বিবাহ নিষিদ্ধ। ঠিক এই রকমটা না হোক্, কিন্তু অনেকটা এই রকমের বাধা নানা আকারে পৃথিবীর সর্বত্র কিছু-না-কিছু দেখা যায়। গোত্র হচ্ছে এক-একটা বড়ো পরিবারের মতো। অর্থাৎ যাঁরা একজন কোনো নামজাদা ঋষির বংশোদ্ভব বলে নিজেদের মনে করেন, তাঁরা সবাই একগোত্রীয়, অর্থাৎ আত্মীয়ের শামিল। প্রধানতঃ

আট জন নামী ঋষির থেকে আটটি গোত্র উৎপন্ন হয়েছে। জমদগ্নি ভরদ্বাজ বিশ্বামিত্র অত্রি গৌতম বশিষ্ঠ কাশ্যপ অগস্ত্য—এই আট জন গোত্রকারী ঋষি। আরো ক'জন আছেন। যেমন, শাণ্ডিল্য পরাশর বৃহস্পতি মৌদ্‌গল্য সৌকালিন সাবর্ণ বাৎস্য, ইত্যাদি। এঁরাও কেউ বড়ো কম যান না। এ ছাড়া ছোটো ছোটোও ক'জন গোত্রকার আছেন।

ব্রাহ্মণ ছাড়া অন্য বর্ণের লোকদের আসলে কোনো গোত্র নেই। কিন্তু তাঁরা তাঁদের ব্রাহ্মণ গুরুপুরোহিতদেরই গোত্র ধারণ করে থাকেন। কুলীন ব্রাহ্মণদের উপাধি দেখেই গোত্র চেনা যায়। সুতরাং সেখানে কোনো অসুবিধা নেই। তাই কেউ মুখুজ্জে ব্রাহ্মণ বরের সঙ্গে হঠাৎ মুখুজ্জে কন্যার বিবাহসম্বন্ধ করতে অগ্রসর হন না।

এখানে বলে রাখা উচিত, বিয়ের সঙ্গেসঙ্গেই মেয়েদের গোত্রান্তর ঘটে, তাঁরা তখন স্বামীরই গোত্র প্রাপ্ত হন। অর্থাৎ বিবাহ হলেই, তাঁরা পিতৃকুলের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে শ্বশুরকুলেরই একাঙ্গ হয়ে পড়েন। এই প্রসঙ্গে রঘুনন্দন এক বৃহস্পতিবচন উদ্ধার করেছেন :

পাণিগ্রহণিকা মন্ত্রাঃ পিতৃগোত্রাচাপহারকাঃ

অর্থাৎ পাণিগ্রহণের মন্ত্রপাঠের সঙ্গেসঙ্গেই কন্যার পিতৃগোত্র অবসৃত হয়।

প্রবর হচ্ছে একই গোত্রের মধ্যে আবার ছোটো ছোটো পরিবার। পুরাকালে গোত্রের প্রধান প্রধান ঋষিদের পুত্রপৌত্রদের নাম অনুসারে প্রবর চিহ্নিত হত। যেমন ভরদ্বাজ গোত্রে, ভরদ্বাজ আঙ্গিরস বার্হস্পত্য — এই তিন প্রবর। কাশ্যপ গোত্রে, কাশ্যপ অপ্সার নৈধ্রুব— এই তিন প্রবর। শাণ্ডিল্য গোত্রে, শাণ্ডিল্য দেবল অসিত— এই তিন প্রবর। এই তিন গোত্রে কোনো গোল নেই। কিন্তু সাবর্ণ গোত্র ও বাৎস্য গোত্রের একই প্রবর—ঔর্ব চ্যবন ভার্গব জামদগ্ন্য আপ্নুবৎ। সুতরাং সাবর্ণ গোত্রীয়দের সঙ্গে বাৎস্য গোত্রীয়দের বিবাহ অচল।

হিন্দু বিবাহে গোত্র-প্রবরের বাধা এত বড়ো বাধা যে, পাছে ভুল করে সগোত্রে কি সমানপ্রবরে বিবাহ ঘটে যায় এই ভয়ে, বিবাহের সময় কন্যাসম্প্রদানের কালে বরপক্ষের ও কন্যাপক্ষের তিনপুরুষের নামের সঙ্গে তাঁদের গোত্র ও প্রবরেরও পুনরাবৃত্তি চলতে থাকে। সংস্কার এতই প্রবল যে, কোনো সময় পাত্র-পাত্রীর একই গোত্র দেখা গেলে, পাত্রীকে প্রথমে ভিন্ন গোত্রীয় কারো হাতে দত্তক দেওয়ার মতো করে দান করে দিয়ে গোত্রান্তরিত করাতে হয়। পরে, দত্তকগ্রহীতার হাত দিয়েই কন্যা-সম্প্রদান করানো হয়।

কিন্তু সগোত্র ও সমানপ্রবর কেন যে বিবাহক্ষেত্রে বাধা, তার যুক্তি দিতে গিয়ে মেধাতিথির মতো অত বড়ো চৌকশ পণ্ডিতেরও মাথা ঘুরে গিয়েছিল। সগোত্রে ও সমানপ্রবরে মিল তো শুধু নামে, সত্যিকার রক্তের সম্পর্ক তো এক বিন্দুও নেই। যুক্তি খুঁজে না পেয়ে মেধাতিথি আমাদেরই মতো শাস্ত্রের দোহাই পেড়েছেন। বলেছেন, শাস্ত্র যখন নির্দেশ দিয়েছেন তখন আর কথা নেই, তা মানতেই হবে।

এবার আসে সপিণ্ড বিবাহের কথা। হিন্দুবিবাহে সপিণ্ড একটা মস্ত বড়ো বাধা। কিন্তু কে সপিণ্ড আর কে যে নয়, তার হিসেব করতে গেলে অঙ্ক কষে বের করতে হয়। সপিণ্ড শব্দের ব্যুৎপত্তিগত মানে ধরতে গেলে অবশ্য বসুধৈব কুটুম্বকম্ হয়ে পড়ে। একই পিণ্ড অর্থাৎ দেহ থেকে যার উৎপত্তি— সপিণ্ডের এই অর্থ করলে, সৃষ্টির আদি থেকে ধরে মনুষ্য জাতি মাত্রেই পরস্পরের সপিণ্ড। তা হলে তো আর কারো সঙ্গে কারো বিবাহসম্বন্ধ করা চলে না।

তাই হিন্দুদের বিবাহক্ষেত্রে সপিণ্ড কথাটার একটা যোগরূঢ় মানে চলে গেছে। শাস্ত্র সাধারণতঃ পাত্রপাত্রীর পিতৃবংশের উপর-নীচের সাত ধাপ আর মাতৃবংশের উপর-নীচের পাঁচ ধাপের মধ্যে সপিণ্ডকে গণ্ডিবদ্ধ

করেছেন। একটু বাড়াবাড়ি হয়ে যায় ভেবে, কোনো কোনো শাস্ত্রকাররা এটাকে একটু সংক্ষেপ করে পিতৃকুলের উপর-নীচের পাঁচ ধাপ ও মাতৃকুলের তিন ধাপের মধ্যে আবদ্ধ রেখেছেন। বাংলাদেশের স্মার্ত ভট্টাচার্য ব্যাপারটাকে আরো সরল করে দিয়ে বিধান দিয়েছেন :

সা বিবাহ্যা দ্বিজাতিনাং ত্রিগোত্রান্তরিতা চ যা

অর্থাৎ ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য বর-কনের মধ্যে তিন গোত্র পার হয়ে গেলেই সপিণ্ডদোষ খণ্ডন হয়ে গেল।

মোটামুটিভাবে সপিণ্ড বিবাহকে নিকট-আত্মীয়ের মধ্যে বিবাহ বলে ধরে নিলে কাজের দিক থেকে কোনো অসুবিধা হবে না। তবে নিকট-আত্মীয়-বিবাহ সম্বন্ধে নানান মুনির নানান মত। অনেক বৈজ্ঞানিক এ রকম বিবাহের ফল ভালো হয় বলে মনে করেন না। আবার বহু বৈজ্ঞানিক এর বিপরীত মতও পোষণ করে থাকেন। কেউ কেউ এও মনে করেন যে, নিকট আত্মীয়-বিবাহ করলে সন্তানসন্ততিতে পিতৃমাতৃ দুই বংশেরই দোষ গুণ উভয়ই অতি উৎকট ভাবে প্রকটিত হয়।

আমাদের শাস্ত্রকাররা তো নিকট-আত্মীয়কে পাঁচ থেকে সাত পুরুষ পর্যন্ত বিস্তৃত করে রেখেছেন; কিন্তু পুরাকালে মিশরের ফ্যারো রাজারা নিজেদের সহোদরা ভগ্নীকে বিবাহ করতেন। অ্যাসেরিয়া ব্যাবিলোনিয়া পারস্যদেশের এবং কিছুদিন আগেও ব্রহ্মদেশের রাজারাও এই কাণ্ড করতেন। ঋগ্বেদেও যম ও যমীর কথোপকথনে দেখা যাচ্ছে, যমের যমজ ভগ্নী যমী যখন যমে সংগত হবার প্রার্থনা জানাচ্ছেন, তখন যম তাঁকে নিবৃত্ত করতে গিয়ে বলছেন, যে কালে ভ্রাতা ভগ্নীতে উপসংগত হতেন, সে কাল অনেকদিন অতীত হয়ে গেছে।[১] তবে যম এও বলছেন:

১ যমযমীর কথোপকথন, ঋগ্বেদসংহিতা, ১০ মণ্ডল, ১০ সূক্ত।

আ ঘা তা গচ্ছানুত্তরা যুগানি যত্র জাময়ঃ কৃণবন্নজামি

অর্থাৎ, ভবিষ্যতে হয়তো এমন যুগ আবার আসবে যখন ভ্রাতাভগ্নী এই রকম সংসর্গ করবে।

কিন্তু এখন :

অন্যমূ যু ত্বং যম্যন্য উ ত্বাং পরি ষ্বজাতে লিবুজেব বৃক্ষম্

হে যমী, লতা যেমন বৃক্ষকে আলিঙ্গন করে তেমনই তুমিও অন্য পুরুষকে আলিঙ্গন কর। এতেই তোমার মঙ্গল হবে।

কিন্তু আপন ভাইভগ্নীর মধ্যে বিবাহ অচল হলেও বৈদিক যুগে মামাতো পিসতুতো ভগ্নীকে বিবাহ করার রীতি যে ছিল, সে কথা স্মৃতিকাররা সপিণ্ডকথার ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে উল্লেখ করেছেন। মহাভারতে তো মাতুলকন্যা বিবাহের বহু দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। অর্জুন সুভদ্রাকে, শিশুপাল ভদ্রাকে, পরীক্ষিৎ ইরাবতীকে বিবাহ করেছিলেন। মাসতুতো ভগ্নী বিবাহের সাক্ষাৎ উল্লেখ না থাকলেও ওটা প্রচলিত ছিল বলেই মনে হয়। তবে কোথাও খুড়তুতো জাঠতুতো ভগ্নীকে বিবাহ করার রীতির কথা বলা নেই। এর কারণ বোধ হয়, মামা মাসি পিসি এঁরা নিকট আত্মীয় হলেও এক পরিবারের অন্তর্গত থাকেন না, তাঁদের কন্যারাও সগোত্র হন না। কিন্তু খুড়ো জ্যাঠা তো বাড়ির লোক; বাপেরই মতো। নামই তো দেখছি, জ্যেষ্ঠতাত বড়োবাবা, খুল্লতাত ছোটোবাবা।

স্মৃতিকাররা কিন্তু বারবার বলেছেন, ওইসব নিকট-আত্মীয়ের মধ্যে বিবাহ বৈদিক যুগে চলে থাকলেও এখন আর চলবে না। কিন্তু বললে কি হয়? অশাস্ত্রীয় বিবাহকে শাস্ত্রবচন ঝেড়ে কোনোকালেই তাড়াতে পারা যায় নি। ভারতবর্ষে এ রকম অনেক নিকট-আত্মীয়কে বিবাহ করার প্রথা এখনো প্রচলিত আছে। দাক্ষিণাত্যে এবং বিহারের জঙ্গলমহালে মামাতো পিসতুতো ভগ্নীকে বিবাহ করা এখনো প্রশস্ত

বিবাহ বলেই গণ্য। দক্ষিণদেশে ভাগ্নীও বিবাহযোগ্যা। উড়িষ্যায় এবং দাক্ষিণাত্যে ও পাঞ্জাবে বড়ো ভাইয়ের বিধবাকে বিবাহ করা অচল নয়। জাঠদের মধ্যে বিধবা পুত্রবধূকেও বিবাহ করতে দেখা যায়। কিন্তু এসব বিবাহ চিরাচরিত প্রথা বলে আইনে অসিদ্ধ না হলেও সমাজে অত্যন্ত নিন্দনীয়।

খ্রীস্টানী বা মুসলমানী সমাজে নিকট-আত্মীয়া অর্থাৎ ফার্স্ট কাজিন, খুড়তুতো জাঠতুতো পিসতুতো মাসতুতো মামাতো ভগ্নীকে বিবাহ করা সমাজেও নিন্দনীয় নয়, আইনেও অচল নয়। হিন্দুসমাজে স্ত্রীর অভাবে শ্যালীকে বিবাহ করে মনের দুঃখ কতকটা লাঘব করা এক সুষ্ঠু ব্যাপার বলে গণ্য হলেও এই সেদিন পর্যন্ত ওটি খ্রীস্টানসমাজে অবৈধ বিবাহ বলেই ধার্য ছিল। অল্প কিছুদিন আগে বিশেষ এক আইন পাস করে ওটাকে বৈধ করতে হয়েছে।

রক্তসম্পর্কে আত্মীয় না হলেও ভদ্রসমাজে সদাচার হিসেবে বিমাতার ভগ্নী, বিমাতার ভায়ের মেয়ে, খুড়ীর ভগ্নী, শ্যালীর মেয়ে, শিষ্যের মেয়ে, গুরুর মেয়ে— এঁদের সঙ্গে বিবাহ পরিত্যাজ্য।

মহাভারতের কচ ও দেবযানীর কথা অনেকেরই জানা আছে। মনে মনে বেশ ইচ্ছে থাকলেও কচ যে দেবযানীকে বিবাহ করতে স্বীকার করেন নি, তার একমাত্র কারণ, দেবযানী কচের গুরু শুক্রাচার্যের কন্যা। এই শুক্রাচার্যের কাছ থেকেই কচ মৃতসঞ্জীবনী-বিদ্যা শিক্ষা করেছিলেন। কচ ও দেবযানীর আখ্যায়িকা নিয়ে রবীন্দ্রনাথ 'বিদায় অভিশাপ' নামে এক অপূর্ব খণ্ডকাব্য রচনা করে গেছেন।

স্মৃতির বইএ দেখা যায়, আরো সামান্য দু-চারটে সদাচারের বাধা হিন্দু বিবাহে আছে। পুরুষের পক্ষে বড়ো ভাই এবং মেয়ের পক্ষে বড়ো ভগ্নী অবিবাহিত থাকতে ছোটোর পক্ষে বিবাহ করাটা সামাজিক

দিক দিয়ে নিন্দনীয়। আইনের বাধা না থাকলেও এরকম বিবাহ সচারচর ঘটতে দেখা যায় না। তবে যেখানে বড়ো ভাই একেবারে বিয়ে করবেন না বলেই স্থির করেছেন সেখানে তাঁর অনুমতি নিয়ে ছোটো ভাই বিবাহ করলে দোষের হয় না। মেয়েদের বেলায় এরকম কাণ্ড প্রায় অসম্ভব। কারণ, পুরাকালে দু-পাঁচজন যোগিনীর সন্ধান পাওয়া গেলেও স্মৃতির যুগে কোনো মেয়ের পক্ষে চিরকুমারী থাকার ইচ্ছাটাকে একটা বদখেয়াল বলেই ধরে নেওয়া হত। তা ছাড়া, বড়ো বোনের বিয়ের আগে ছোটোবোনের বিয়ে হয়ে গেলে বড়ো বোন তো একেবারে দ-এ পড়ে গেলেন, তখন আর তাঁর বিয়ে হওয়া দায়। আর-এক সদাচারের বাধা, পাত্রীর নাম যদি পাত্রের মা'র নামের একই নাম হয়। সেরকম নামের কন্যা বিবাহের অযোগ্য।

হিন্দু আইনে আরো-একটা বড়ো বাধা আছে যেটা বেশ-একটু এক তরফা গোছের ব্যাপার। সকলেই জানেন যে, হিন্দু পুরুষ এক সঙ্গে বহুবিবাহ করতে পারেন। বেশি দিনের কথা নয়, এই দেড় শো কি দু'শো বছর আগেও কুলীন ব্রাহ্মণরা এক সঙ্গে শতাধিক পত্নীও গ্রহণ করতেন। কিন্তু অতগুলো স্ত্রী নিয়ে এক সঙ্গে ঘর করা শক্ত হত। তাই অনেক কুলীন কন্যাকে বিবাহের পরও আমরণ পিত্রালয়ে বাস করতে হত। আর অতগুলো স্ত্রীর নাম মনে রাখাও শক্ত। তাই স্ত্রীদের নাম-ধাম জ্ঞাতি-গোত্র চিহ্ন-পরিচয় খেরোয় বাঁধানো মোটা মোটা খাতায় লেখা থাকত। স্বামীপ্রবর ঘুরে ঘুরে খোঁজ করতে করতে এক এক শ্বশুরবাড়িতে এক একবার উঠে সেখানে আহারাদি সুসম্পন্ন করে কৌলীন্যের মর্যাদা আদায় করে বেড়াতেন। বহুবিবাহে তাঁদের বিন্দুমাত্র অরুচি থাকার কথা নয়। তাঁরা মুখে বলতেন, কুলীন কন্যার কুলরক্ষা করা তো ধর্মের কাজ। একই বাড়িতে এক রাত্রে অমন চার-পাঁচজন কুলীন কন্যা এক

সঙ্গে পার করে দিতেন, একবার এ পিঁড়িতে আর-একবার ও পিঁড়িতে বসে।

কথাটা আজকালকার লোকদের কাছে নেহাত রূপকথা বলে ঠেকবে। কারণ, আইন স্বপক্ষে থাকলেও আজকাল কোনো হিন্দু পুরুষই আর সহজে এক সঙ্গে একাধিক বিবাহ করেন না। এটা যে নিতান্ত অনিচ্ছাবশতঃ, তা নাও মনে হতে পারে। এই অর্থসংকটের দিনে এক স্ত্রীরই ভরণপোষণ আবদার-অভিযোগ মান-অভিমান পূরণ করতে করতে স্বামী বেচারার তো জেরবার হবার জোগাড়। সুতরাং দ্বিতীয় স্ত্রী গ্রহণ করা তো পরের কথা, একবার বিবাহের কথা মনে ভাবতেও অনেক সুযোগ্য পাত্রের মাথাঘোরার ব্যামো উপস্থিত হতে দেখা যায়। তা ছাড়া হৃদয়গগনে যাই হোক-না কেন, গৃহস্থালীতে একশ্চন্দ্রই তমো হন্তি। সেখানে দুই বা তদধিক চন্দ্রিকার উদয় হলে অনর্থ অনিবার্য। এর প্রধান কারণ, সপত্নীর উপর বিদ্বেষ মেয়েদের সেই সৃষ্টিকাল থেকে। যদিও মনু-মহারাজ বিধান দিয়েছেন :

> অধিবিন্না তু যা নারী নির্গচ্ছেদ্ রুষিতা গৃহাৎ।
> সা সদ্যঃ সন্নিরোদ্ধব্যা ত্যাজ্যা বা কুলসন্নিধৌ ॥
>
> —মনুসংহিতা, ৯ অধ্যায়, ৮৩ শ্লোক

অর্থাৎ, স্বামী আবার বিবাহ করলে যে নারী রুষ্ট হয়ে গৃহত্যাগ করতে উদ্যত হন, তাঁকে তৎক্ষণাৎ অবরোধ করে রাখতে হবে এবং এর পর আরো বাড়াবাড়ি করলে, তাঁর পিতৃকুলের সকলের সামনে তাঁকে পরিত্যাগ করবে।

তবুও সপত্নীকণ্টক দূর করবার জন্যে ঋগ্‌বেদে একটা গোটা সূক্তে ছ-ছটা ঋকে রচিত একটা আস্ত স্তব আছে। পাঠকদের কৌতুক বোধ হতে পারে মনে করে, আমি স্তবটার আগাগোড়াই এখানে তুলে দিচ্ছি :

ইমাং খনাম্যোষধিং বীরুধং বলবত্তমাম্।
যয়া সপত্নীং বাধতে যয়া সংবিন্দতে পতিম্॥

আমি এই মহাশক্তিধারী ওষধিলতা খনন করছি। এর দ্বারাই আমি সপত্নীকে ক্লেশ দিতে পারব, পতিরও প্রণয় লাভ করতে সক্ষম হব।

উত্তানপর্ণে সুভগে দেবজুতে সহস্বতি।
সপত্নীং মে পরা ধম পতিং মে কেবলং কুরু॥

হে সৌভাগ্যদায়ী ওষধি, তোমার পত্রসকল বিকশিত হয়ে উঠল। তুমি তো দেবতাদেরই সৃষ্টি। তুমি তোমার প্রবল দৈব তেজের মহিমায় আমার সপত্নীকণ্টক দূর কর; যাতে আমার পতি একমাত্র আমারই হয়ে থাকেন।

উত্তরাহমুত্তর উত্তরেদুত্তরাভ্যঃ।
অধা সপত্নী যা মমাধরা সাধরাভ্যঃ॥

হে ওষধি, তুমি লতাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। তোমার প্রসাদে আমিও যেন পতির কাছে প্রধান হয়ে থাকি, উত্তরোত্তর যেন তাঁর প্রিয় হতে পারি। আর, আমার সপত্নী যেন সেই সঙ্গে নিকৃষ্ট থেকে নিকৃষ্টতর হতে থাকে, যেন অধোগতির পর অধোগতি প্রাপ্ত হয়।

নহি অস্যা নাম গৃভ্ণামি নো অস্মিন্ রমতে জনে।
পরামেব পরাবতং সপত্নীং গময়ামসি॥

আমি সপত্নীর নাম পর্যন্ত মুখে আনি না। কোনো নারীই সপত্নীতে খুশি হতে পারেন না। আমি যেন স্বামীর নিকট থেকে সপত্নীকে দূর হতে দূরান্তে পাঠাতে পারি।

অহমস্মি সহমানাথ ত্বমসি সাসহিঃ।
উভে সহস্বতী ভূত্বী সপত্নীং মে সহাবহৈ॥

হে ওষধি, তোমার প্রচুর শক্তি। আমারও শক্তি বড়ো কম নয়। এস,

আমরা পরস্পরের শক্তি একত্র করে উভয়ে মিলে সপত্নীকে পরাভূত করি।

উপ তেঽধাং সহমানামভি ত্বাধাং সহীয়সা।
মামনু প্র তে মনো বৎসং গৌরিব ধাবতু পথা বারিব ধাবতু ॥

হে পতি, এই শক্তিশালী ওষধিলতা আমি তোমার শিরোভাগে স্থাপন করছি। তুমি একে তোমার উপাধান কর। গাভী যেমন বৎসকে অনুধাবন করে, জল যেমন নিম্নভূমিতে ধাবিত হয়, তেমনই, তোমার মন যেন এই ওষধির বলে আমার প্রতি সতত ধাবন করে[২]।

এই স্তব রচনা করেছেন ইন্দ্রাণী নামে এক স্ত্রী-ঋষি। কিন্তু দেবী ইন্দ্রাণী ঐ ওষধি-লতাকে যতই পরাক্রমশালী বলে বর্ণনা করুন-না কেন, তার দ্বারা যে পুরুষজাতির বহু বিবাহ বন্ধ হতে পেরেছিল তা বলে তো বিশ্বাস হয় না, তা সে কি সত্য কি ত্রেতা কি দ্বাপর আর কি কলি, চার যুগের কোনো যুগেই। আর কি আর্যাবর্তে কি দাক্ষিণাত্যে, কি উত্তর দক্ষিণ পূর্ব পশ্চিম ভারতবর্ষের কোনো অঞ্চলেই নয়।

এই নিয়ে এক চলতি ছড়াও বোধ হয় অনেকের জানা আছে, যে ছড়া প্রায় প্রবাদ বাক্য হয়ে দাঁড়িয়েছে :

বঁটি! বঁটি! বঁটি!
সতীনের শ্রাদ্ধে কুটনো কুটি।
অসৎ কেটে বসত করি, সতীন কেটে আলতা পরি ॥

কিন্তু এ বিষয়ে মেয়েদের বেলায় হিন্দু আইনের বিষম জবরদস্তি। এক স্বামী জীবিত থাকতে আর-এক স্বামী! কথাটা শুনলেই যে-কোনো হিন্দু কানে আঙুল দিয়ে রাম রাম হরি হরি করে উঠবেন। অমন চলমান বৈদিক যুগেও এক স্ত্রীর বহু পতির কথা শোনা যায় না।

২ ঋগ্‌বেদসংহিতা, ১০ মণ্ডল, ১৪৫ সূক্ত ১-৬ ঋক্

তবে মহাভারতে দ্রৌপদীর এক সঙ্গে পঞ্চ স্বামী গ্রহণের কথা অবশ্য সবাই জানেন। কিন্তু এটা নিয়মের ব্যতিক্রম মাত্র। রহস্য এই যে, পূর্বজন্মে নাকি দ্রৌপদী মহাদেবের কাছে পাঁচ-পাঁচবার একই বর প্রার্থনা করে জানিয়েছিলেন যে, তিনি সর্বগুণসম্পন্ন পতিলাভের ইচ্ছা করেন। মহাদেব সন্তুষ্ট হয়ে বর দিলেন, ভদ্রে, তোমার তবে পঞ্চ পতিই হোক। মহাদেবের বর! সে তো ফেলনা যেতে পারে না। পরজন্মে তাই দ্রৌপদীকে পঞ্চপাণ্ডবকে এক সঙ্গেই পতিরূপে বরণ করতে বাধ্য হতে হল।

দ্রুপদরাজা যখন এই অশাস্ত্রীয় বিবাহ দিতে একটু ইতস্তত: করছিলেন তখন ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির তাঁর সামনে দুটি নজির উপস্থিত করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন : পুরাণে শুনতে পাওয়া যায়, গৌতম-বংশীয় জটিলা সাত-সাতজন মুনিকে একই সঙ্গে স্বামীরূপে গ্রহণ করেছিলেন। সেই রকম আবার মুনিকন্যা বার্ক্ষীও প্রচেতা নামে দশ ভাইকে একই সঙ্গে বিবাহ করেন। তখন দ্রুপদরাজ চুপ। আর আপত্তি ওঠাতে পারলেন না। কিন্তু মহারাজ যুধিষ্ঠির যে কোন্ পুরাণ থেকে নজির দেখালেন, সেটা আর ব্যক্ত করে বলেন নি।

বেদব্যাস কিন্তু নজির না দেখিয়ে অন্য উপায়ে সমস্যার সমাধান করেছিলেন। তিনি স্পষ্টই স্বীকার করেছেন, মানুষের বিবাহে এ-রকম কোনো বিধান নেই। তবে পাণ্ডবরা কিনা দেবতার অবতার আর দ্রৌপদী নিজেও কিনা লক্ষ্মীর অংশ, তাই দেবতাদের মধ্যে এই ধরনের বিবাহ অনায়াসে চলতে পারে। দেবতাদের লীলাখেলা অবশ্য আলাদা। যাই হোক, সমস্ত হিন্দুশাস্ত্রে এই তিনটি ছাড়া স্ত্রীলোকদের এক সঙ্গে একাধিক পতি গ্রহণের আর কোনো উদাহরণ খুঁজে পাওয়া যায় না। বর্তমান কালের অলঙ্ঘ্য দণ্ডতন্ত্র ইণ্ডিয়ান পিনাল কোডের ৪৯৪ ধারা অনুসারে এরকম বিবাহে শাস্তি, দু-বছরের জেল।

কিন্তু শাস্ত্রই কি আর পিনাল কোডই বা কি, লোকাচারের কাছে কিছুই কিছু নয়। বায়লজির পণ্ডিতেরা বলেন, যে জায়গায় কঠোর পরিশ্রম করে জীবিকা সংগ্রহ করতে হয় সেখানে কন্যাসন্তানের চেয়ে পুত্রসন্তান জন্মায় বেশি। সুতরাং সেসব জায়গায় এক রকম দায়ে পড়েই একই মেয়েকে এক সঙ্গে বহু স্বামী গ্রহণ করতে হয়। হিমালয়ের পাদদেশে নেপাল তেরাই অঞ্চলে নেওয়ার বলে যে এক সম্প্রদায়ের উপজাতি আছে, তাদের মধ্যে মেয়ের সংখ্যা ছেলের চেয়ে অনেক কম বলে সেখানে মেয়েদের এক সঙ্গেই বহু পতি দেখা যায়। কুমায়ুনে ব্রাহ্মণগোষ্ঠীর মধ্যেও এরকম বিবাহ প্রচলিত আছে। আবার দাক্ষিণাত্যে কানাড়া ও মালাবার অঞ্চলের তেলেগুদের মধ্যে তোত্তিয়র উপজাতির মধ্যে মাদুরার কলহ্বার সম্প্রদায়ের মধ্যে, স্ত্রীলোকদের এক সঙ্গে বহু পতি প্রসিদ্ধ। তবে বাঁচোয়া এইটুকু যে, মেয়েদের বহু পতি গ্রহণ যৌথ পরিবারের ভাইয়েদের মধ্যেই সচরাচর আবদ্ধ থাকতে দেখা যায়, তার বাইরে বড়ো একটা যেতে দেখা যায় না।

হিন্দু আইন অনুসারে এমন-কি বিধবা অবস্থাতেও মেয়েদের পুনর্বিবাহ নিষিদ্ধ। বৈদিক আমলে কিন্তু বিধবা বিবাহ অচল ছিল না। বরং স্বামী মারা গেলে বিধবা, বিশেষতঃ অবীরা বিধবা, স্বামীর কনিষ্ঠকে পতিরূপে গ্রহণ করলে কোনোই পাপ হত না। দেবর মানেই তো দ্বিবর অর্থাৎ দ্বিতীয় বর। পুরাণেও আছে :

> মৃতে তু দেবরে.দেয়াৎ তদভাবে যথেচ্ছয়া।
>
> —অগ্নিপুরাণ, ১৫৪ অধ্যায় ৬ শ্লোক

অর্থাৎ স্বামী মৃত হলে দেবরকে পতিরূপে গ্রহণ করা যেতে পারে। দেবর না থাকলে যথেচ্ছ স্বামী গ্রহণ চলতে পারে। স্মৃতিকারদের আমলেই বিধবা বিবাহ বন্ধ হয়ে যায়।

স্মৃতিকাররা বিধবা বিবাহের বিরুদ্ধে থাকলেও এবং বিধবাকে সর্বদাই ব্রহ্মচর্যপালনের ভূরি ভূরি সদুপদেশ দিলেও নিতান্ত অনিচ্ছায় যেন দুজন স্মৃতিকার— পরাশর ও নারদ— আপৎকালে পত্যন্তর গ্রহণের একটা বিধি দিয়েছেন :

নষ্টে মৃতে প্রব্রজিতে ক্লীবে চ পতিতে পতৌ।
পঞ্চস্বাপৎসু নারীণাং পতিরণ্যো বিধীয়তে ॥
—পরাশরসংহিতা, ৪ অধ্যায়, ২৬ শ্লোক
—নারদসংহিতা, ১২ অধ্যায়, ৯৭ শ্লোক

অর্থাৎ, স্বামী যদি মৃত কি নিরুদ্দিষ্ট হন কি সন্ন্যাসগ্রহণ করেন কিংবা ক্লীব প্রতিপন্ন হন কিংবা সমাজে পতিত হন, তা হলে এই পাঁচ রকমের আপদে স্ত্রী অন্য পতি গ্রহণ করতে পারেন।

মনু-মহারাজ কিন্তু বিধবা বিবাহের উপর খড়্গহস্ত। তিনি স্পষ্টই বলেছেন :

ন দ্বিতীয়শ্চ সাধ্বীনাং কচিদ্ ভর্তোপদিশ্যতে।
—মনুসংহিতা, ৫ অধ্যায়, ১৬২ শ্লোক

অর্থাৎ, সাধ্বী স্ত্রীর দ্বিতীয়বার বিবাহ কেউই উপদেশ দেন না।

আবার :

ন বিবাহবিধাবুক্তং বিধবাবেদনং পুনঃ।
—মনুসংহিতা, ৯ অধ্যায়, ৬৫ শ্লোক

অর্থাৎ, কোনো বিবাহ-বিধানেই বিধবার পুনর্বিবাহের কথা বলা নেই।

তিনি বরং উলটে উপদেশ দিচ্ছেন :

মৃতে ভর্তরি সাধ্বী স্ত্রী ব্রহ্মচর্যে ব্যবস্থিতা।
স্বর্গং গচ্ছতি অপুত্রাপি যথা তে ব্রহ্মচারিণঃ ॥
—মনুসংহিতা, ৫ অধ্যায়, ১৬০ শ্লোক

অর্থাৎ, সাধ্বী স্ত্রী স্বামীর মৃত্যুর পর ব্রহ্মচর্য পালন করবেন। অপুত্রা হলেও সেই স্ত্রী নিশ্চয়ই স্বর্গে যাবেন ; যেমন ব্রহ্মচারী সনকবালখিল্যাদি পুত্রহীন হয়েও স্বর্গে গিয়েছিলেন।

অপত্যলোভাদ্ যা তু স্ত্রী ভর্তারমতিবর্ততে।
সা ইহ নিন্দামাপ্নোতি পতিলোকাচ্চ হীয়তে॥
—মনুসংহিতা, ৫ অধ্যায়, ১৬১ শ্লোক

অর্থাৎ, পুত্রহীনা যে স্ত্রী স্বর্গে যাবার ইচ্ছায় পুত্রলোভে মৃত স্বামীকে অপমানিত করে দ্বিতীয়বার পতিগ্রহণ করেন, তিনি ইহলোকে তো নিন্দাপ্রাপ্ত হনই পরন্তু স্বর্গলোক থেকেও বঞ্চিত হন।

আজকাল কারো আর স্বর্গের লোভ নেই, নরকেরও ভয় নেই। এখন আমরা মনুকেও মানতে পারি, কি ইচ্ছা করলে পরাশর-নারদকেও মানতে পারি ; যেমন অভিরুচি।

টীকাকার ও নিবন্ধকারদের আমলে পরাশর ও নারদ মুনির ঐ শ্লোক লোকে প্রায় ভুলেই গিয়েছিল। যাঁরা ভোলেন নি, তাঁরা 'পতিরণ্যঃ' কথাটার এক মজার ব্যাখ্যা করেছেন। তাঁরা পতি মানে স্বামী না করে প্রভু করেছেন। তাঁদের মতে ওই রকম আপৎকালে স্ত্রীলোক অন্য কারো বাড়িতে দাসীবৃত্তি অবলম্বন করতে পারেন। অনেক কাল পরে বিধবা বিবাহের প্রমাণ হিসেবে বিদ্যাসাগর মশায় ও-দুটোকে বহু কষ্টে খুঁজে বার করেন।

তবে আমার মনে হয়, বিধবা-বিবাহ বন্ধ হয় শাস্ত্রের দোহাইয়ের জন্যে নয়, ও বিষয়ে মেয়েদের নিজেদেরই একটা স্বাভাবিক অনিচ্ছা আছে বলেই। তাঁরা সাধারণতঃ বিবাহের উপর পুরুষের চেয়ে ঢের বেশি গুরুত্ব আরোপ করে থাকেন। এবং ওটাকে কেবল একটা বায়লজিক্যাল ব্যাপার না মনে করে, তাকে একটা আধ্যাত্মিক কাণ্ড বলেই ধারণা করে

নিয়ে মনে মনে সন্তোষ লাভ করে থাকেন। তাইতেই দেখা যায়, ইংরেজ আমলে যখন আইন করে বিধবা বিবাহ সুসিদ্ধ করা হল, তখনো ভদ্রসমাজের বিধবারা তার সুযোগ খুব কমই নিয়েছেন। যাঁরা নিয়েছিলেন তাঁদের সংখ্যা আঙুলে গোনা যায়।

তবে ভারতবর্ষে নিম্নস্তরের সমাজে বিধবা বিবাহ কিংবা স্বামীর দ্বারা পরিত্যক্ত হলে কি স্বামী নিখোঁজ হলে সেই স্ত্রীর আবার বিবাহ, অমন আকছার ঘটছে। সেটা স্রেফ মেয়ের সংখ্যা ঐ সমাজে পুরুষের চেয়ে কম বলে।

হিন্দুমতে এক সন্ন্যাসী ছাড়া আর সকলের বিবাহ অবশ্য কর্তব্য, বিশেষতঃ শূদ্রবর্ণের ও স্ত্রীজাতির। কারণ, শাস্ত্রে তাঁদের জন্যে ঐ একটি বই আর তুটি সংস্কারের ব্যবস্থা নেই, অর্থাৎ নিজেকে শুদ্ধ করবার আর কোনো উপায় নেই। তা ছাড়া, যখন থেকে শাস্ত্রকাররা বিবাহের একটা আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা দিতে শুরু করলেন তখন থেকেই লোকের মনে এই সংস্কারই বদ্ধমূল হয়ে গেল যে, বিবাহ করে সন্তান উৎপাদন না করলে পিতৃঋণ শোধ করা যায় না। আর পুত্রসন্তান না হলে নরকের থেকেও তো কোনোকালে উদ্ধার নেই।

এই যখন সমাজের মনোভাব তখন হিন্দু আইনে কেউই বিবাহের অযোগ্য হবার কথা নয়। কানা খোঁড়া বোবা কালা ব্যাধিতে পঙ্গু পাগলা আধপাগলা ছিটগ্রস্ত জড়বুদ্ধি ক্লীব নপুংসক, কারো হিন্দুবিবাহে বাধা নেই। বিংশ শতাব্দীর বেয়াল্লিশ সালে, মাদ্রাজ হাইকোর্টের জজদের এক ফুলবেঞ্চের রায়ে এ কথাটা আবার স্পষ্ট করে স্বীকার করা হয়েছে।

মোটকথা বিবাহ একটা করাই চাই। এবং তা যখন করতেই হবে তখন সকাল সকাল ওই কার্যটি সেরে নেওয়াই তো বুদ্ধির কাজ। শাস্ত্র অনুসারে লেখাপড়ার কাজ খতম হলেই বিবাহের কাজ এসে পড়ে।

তখনকার দিনে ব্রাহ্মণকুলের ছেলেদের পাঠ শেষ করতেই বয়স পঁচিশ-ছাব্বিশ পার হয়ে যেত। কিন্তু প্রাচীনকালের প্রথামতো গুরুগৃহে বাস করে লেখাপড়া সাঙ্গ করার ধারা যখন উঠে গেল তখন এই স্থির হল যে, দ্বিজাতির অর্থাৎ যাঁদের পৈতে হয়—ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য— তাঁদের পক্ষে উপনয়নের আগে বিবাহ করাটা শাস্ত্রীয় কাজ নয়। ব্রাহ্মণসন্তানের সাধারণতঃ আট বছরে, ক্ষত্রিয় সন্তানের এগারো বছরে, বৈশ্য সন্তানের বারো বছরে, উপনয়নসংস্কার হবার কথা। কিন্তু শূদ্রবর্ণের সন্তানদের বিবাহটাই একমাত্র সংস্কার বলে জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত যে-কোনো সময় তাঁদের পক্ষে বিবাহের উপযুক্ত সময়।

স্ত্রীজাতির বেলাতেও তাই। বৈদিক যুগে যে প্রথাই থাক্-না কেন, স্মৃতিকারদের আমলে মেয়েদের বিয়ের উপযুক্ত বয়স কমতে কমতে এমন জায়গায় এসে দাঁড়িয়েছিল যে, অনেকে মনে করেন সে বয়স তাঁদের পুতুলখেলার বয়স। স্মৃতিকারেরা বিবাহযোগ্য মেয়েদের পাঁচ ভাগে ভাগ করেছেন। প্রথম নগ্নিকা, অর্থাৎ যখন তাঁরা নগ্ন হয়ে থাকলেও কিছু দোষের হয় না; দ্বিতীয় গৌরী, অর্থাৎ আট বছরের মেয়ে; তৃতীয় রোহিণী, অর্থাৎ নয় বছরের মেয়ে; চতুর্থ কন্যা, অর্থাৎ দশ বছরের; পঞ্চম রজস্বলা, অর্থাৎ দশ বছরের উপর।

মনুর মতে গৌরীদানই প্রশস্ত। কোনো কোনো স্মৃতিকারেরা নগ্নিকাবিবাহই পছন্দ করেছেন। একজন বাড়াবাড়ি করে উপদেশ দিয়েছেন :

জাতমাত্রা তু দাতব্যা কন্যকা সদৃশে বরে

সব স্মৃতিকারেরই মতে রজস্বলা কন্যা যতদিন অবিবাহিত রইবেন ঠিক ততদিন ধরে সেই কন্যার পিতাও নরকস্থ থাকবেন। তাঁরা এও বলেছেন যে, রজস্বলা হবার পরও যদি কোনো পিতা কন্যার বিবাহ-

বিষয়ে অমনোযোগী থাকেন তা হলে সে কন্যা নিজেই উপযুক্ত পতির সন্ধানে বেরিয়ে পড়তে পারেন।

আমাদের দু-এক পুরুষ আগেও মেয়েদের বছর বারো আর ছেলেদের উনিশ-কুড়ি বছর বয়স পার হবার আগেই তাঁদের বিয়ে হয়ে যেত। কিন্তু তার খানিক আগে আবার পালটি ঘর না পাওয়ার দরুন অনেক কুলীনের ঘরে ষাট-পঁয়ষট্টি বছরেরও আইবুড়ো মেয়ে দেখা যেত। আমার জানা বেহালার এক নৈকষ্য কুলীন ব্রাহ্মণবংশে প্রচার আছে যে, তাঁদের বাড়ির এক ষাট বছরের কুমারীর সঙ্গে গঙ্গাযাত্রী এক মুমূর্ষু কুলীন পাত্রের বিবাহ দেওয়া হয়েছিল। বিয়ের ঠিক চার দিন পরেই তিনি বিধবা হন। তবু তো তাঁর আইবুড়ো নাম ঘুচেছিল।

সে যাই হোক, আমরা হালফিলের লোকেরা এই পার্থিব লোকেই অহরহ এত রকমের নরক দর্শন করে থাকি যে, আসল নরকে যাবার ভয় আমাদের কেটে গেছে। সুতরাং আমাদের ঘরে এখন সেকালের তুলনায় মেয়েরা একটু বেশি বয়স পর্যন্তই অবিবাহিত থাকেন। এমন কি দেখতে পাওয়া যাচ্ছে, প্রাচীনকালের স্বয়ংবর হওয়ার প্রথাটা যেন আবার ফিরে ফিরে আসছে।

বায়লজি নিয়ে যাঁরা বেশি নাড়াচাড়া করেন তাঁরা বলেন, বিবাহক্ষেত্রে পুরুষের চেয়ে স্ত্রীর বয়স সাত থেকে দশ বছর কম হওয়াই ভালো। তাঁরা কারণ দেখান যে, মেয়েরা পুরুষদের অনেক আগেই জরাগ্রস্ত হয়ে পড়েন। এটা সুষ্ঠু কারণ কি না, সে বিষয়ে তর্ক আছে। তবে মনুর মতে চব্বিশ বছরের ছেলের সঙ্গে তার তিন ভাগের কম বয়সের মেয়ের বিবাহ দেবার ব্যবস্থাতে বয়সের পার্থক্য যে একটু বেখাপ্পা রকমের বিষম হয়ে দাঁড়ায়, সে বিষয়ে আজকাল কারো আর দ্বিমত নেই।

সব দেশেই সাধারণতঃ পুরুষরা নিজের চেয়ে কম বয়সেরই মেয়ে

বিবাহ করে থাকেন। কিন্তু এর কিছু কিছু ব্যতিক্রমও দেখতে পাওয়া যায়। বিশেষ করে ইওরোপীয় সমাজে। হিন্দুসমাজে ওটা কেউ সহজে ভাবতে না পারলেও যদি ক্বচিৎ বরের চেয়ে কনে বয়সে বড়ো হয়ে যান, তা হলে সে বিবাহ যে অসিদ্ধ হয়ে যাবে এমন কোনো নির্দেশ আইনের কেতাবে কোথাও দেওয়া নেই।

যেহেতু গৌরীদান হিন্দুসমাজে এক সময় সাধারণ নিয়ম ছিল, তাই বিবাহব্যাপারে কে যে কন্যার অভিভাবক তার একটা ফর্দও হিন্দু আইনে পাওয়া যাচ্ছে। অর্থাৎ, এই অভিভাবকরাই কন্যার বিবাহ-ব্যবস্থা করার ও কন্যা-সম্প্রদানের অধিকারী। আইনের মতে প্রথম আসেন কনের বাপ। তার পর আসেন কনের ঠাকুরদা। এর পর কনের ভাই। এঁরা কেউ না থাকলে, পিতৃকুলের অন্যান্য পুরুষ-আত্মীয়; সম্পর্কে নিকট-আত্মীয় আগে, দূর-সম্পর্কের আত্মীয় পরে। সব শেষে কনের মা। বাংলাদেশে এই ক্রমের একটু ব্যতিক্রম আছে। কনের মায়ের আগে আসেন কনের মাতামহ ও মাতুল। বিয়ের পর স্বামীই স্ত্রীর একমাত্র অভিভাবকের পদ প্রাপ্ত হন। তবে যেখানে স্বামী নিজেই নাবালক সেখানে স্বামীর অভিভাবককেই বধূরও অভিভাবক বলে ধরে নেওয়া হয়।

মেয়েদের সর্বদাই একজন অভিভাবক দরকার। কথাটা অবশ্য আমার নিজের নয়, শাস্ত্রেরই উক্তি। স্বয়ং মনু বলেছেন:

> পিতা রক্ষতি কৌমারে ভর্তা রক্ষতি যৌবনে।
> রক্ষন্তি স্থবিরে পুত্রা ন স্ত্রী স্বাতন্ত্র্যমর্হতি॥
>
> —মনুসংহিতা, ৯ অধ্যায়, ৩ শ্লোক

অর্থাৎ, স্ত্রীলোকের সব বয়েসেই এক-একজন করে রক্ষাকর্তা আছেন। কৌমারে পিতা, যৌবনে স্বামী, বৃদ্ধাবস্থায় পুত্রগণ। স্ত্রীলোকের স্বাতন্ত্র্য থাকা উচিত হয় না।

মেয়েরা সর্বদাই লতার মতো কোনো-না-কোনো পুরুষবৃক্ষকে আঁকড়ে ধরে থাকবেন, শাস্ত্রকারদের এই মত। এইটেই হল তাঁদের মতে সাধু রীতি। আধুনিক মেয়েরা যে এ কথা শুনে আহ্লাদে আটখানা হয়ে উঠবেন না, তা জানা কথা। বরং, মনু-মহারাজকেই হয়তো তাঁরা শাপ-শাপান্ত করতে বসে যাবেন। কিন্তু আমাদের ঘরোয়া ব্যাপারেও তো এই রীতিই দেখি। ছেলেবয়সে মেয়েরা অমুকের মেয়ে বলে পরিচিত। বিবাহ হলে অমুকের স্ত্রী। সন্তানবতী হলে, অমুকের মা। ইংরিজি মিস্ বা মিসেস্ শব্দের (সধবা ও বিধবা উভয় প্রকারান্তরে) ঠিক জুতসই দিশী প্রতিশব্দ কই? আমরা জোর করে যেসব কথা ব্যবহার করি সেগুলো পোশাকি কাপড়ের মতো, একটু চাপ পড়লেই তা খসে পড়ে যায়। কার্যকালেও তো ঐ একই ব্যাপার। মেয়েরা বিবাহের পর স্বামীর পদবী গ্রহণ করেন, স্বামীর গোত্র ধারণ করেন, স্বামীর বাড়িতেই গিয়ে বসবাস করেন।

মনু শুধু স্বাতন্ত্র্যের কথাই উল্লেখ করে থেমে যান নি। বেচাল দেখলে, স্ত্রীকে একটু শাসন করার ব্যবস্থাও দিয়ে গিয়েছেন। ব্যবস্থাটা যে কি, তা আমি সকলের সামনে প্রকাশ করতে সাহস পাচ্ছি নে। আপনারা মনুসংহিতার ৮ম অধ্যায়ের ২৯৯ শ্লোক একবার দেখে নিতে পারেন।

হিন্দুসমাজে বিয়ে যখন করতেই হবে তখন একটু দেখে শুনে নিয়ে করাই তো ভালো। মনু উপদেশ দিয়েছেন, সুলক্ষণা কন্যা দেখে বিবাহ করবে। এই বলেই তিনি কিন্তু শেষ করেন নি, অলক্ষণার লক্ষণও কিঞ্চিৎ বর্ণনা করে গেছেন :

> নোদ্বহেৎ কপিলাং কন্যাং নাধিকাঙ্গীং ন রোগিণীম্।
> নালোমিকাং নাতিলোমাং ন বাচাটাং ন পিঙ্গলাম্॥
>
> —মনুসংহিতা, ৩ অধ্যায়, ৮ শ্লোক

অর্থাৎ, যে কন্যার চুল কটা, যাঁর হাতে পাঁচের বেশি আঙুল, যিনি রুগ্ণা, যিনি স্বল্পকেশা, কিংবা যাঁর শরীরে প্রচুর লোম, যিনি বাচাল ও কটুভাষিণী, যাঁর চোখ কটা— এইসব কন্যা বিবাহের যোগ্য নন।

আবার নামেতেও সুলক্ষণ-কুলক্ষণ আছে :

নর্ক্ষবৃক্ষনদীনাম্নীং নান্ত্যপর্বতনামিকাম্।
নপক্ষ্যহিপ্রেষ্যনাম্নীং ন চ ভীষণনামিকাম্॥

—মনুসংহিতা, ৩ অধ্যায়, ৯ শ্লোক

অর্থাৎ, নক্ষত্র বৃক্ষ নদীর নামে যে কন্যার নাম, কিংবা যাঁর ম্লেচ্ছ নাম, যাঁর পর্বতের নাম, যাঁর পক্ষীর নাম, সর্পের নাম, দাসদাসীর নাম, যাঁর নাম অতি ভীষণ—সেসব কন্যাও বিবাহের অযোগ্য।

একালে এত বাছাই করতে গেলে তো গাঁ উজাড় হয়ে যাবে। অনেক সুপাত্রীও তো তা হলে বাদ পড়ে যান। কিন্তু এগুলো বিধি মাত্র, নিষেধ নয়। অর্থাৎ, এসব উপদেশ অমান্য করলেও তাতে বিবাহ অসিদ্ধ হয়ে যাবে না। তবে আজকালকার বাপ মা কেউই আর ইচ্ছে করে মেয়ের ভীষণ নাম রাখেন না, দুই কি তিন অক্ষরের মধুর নামই রেখে থাকেন। আমাদের ছেলেবয়সের সুন্দরী মোহিনী বালা লতা কুমারী ভাবিনী হাসিনী কামিনী রানী মুখী ময়ী বতী, এইসব প্রত্যয়ান্ত নাম তো আজকাল উঠেই গেছে। ঠাকুরদেবতার নামেও কারো আর রুচি নেই। তবে আমাদের কিছু পূর্ববর্তীদের সময়কার আইভিলতা-সুন্দরী ম্যারিগোল্ডহাসিনী গ্যাসলাইটশোভিনী ভিক্টোরিয়াকামিনী, ইত্যাদি রকমারি নাম যে উঠে গেছে সে একরকম ভালোই হয়েছে বলতে হবে।

পুরাকালে কিন্তু কিছু কিছু ভীষণনাম্নী দেখতে পাওয়া যেত। রামায়ণের শূর্পণখার নাম কারো অপরিচিত নয়। কিন্তু তৎসত্ত্বেও

বিদ্যুজ্জিহ্ব বলে এক সমান সমান ঘরের পাত্র এঁর কপালে জুটেছিল। তাঁতে সন্তুষ্ট না থেকে তিনি যে কি বিপদ ডেকে এনেছিলেন তা সবারই জানা কথা। মহাভারতের হিড়িম্বাও ভীমের মতো সৎপাত্রে পড়েছিলেন।

সেকালে এক স্ত্রী-কবি ছিলেন। তিনি বেশ ভালো ভালো সংস্কৃত চূর্ণকবিতা লিখে গেছেন। নাম কিন্তু তাঁর বিকটনিতম্বা। ইনি ভালো বর পেয়েছিলেন কি না, সে খবর অবশ্য আমার জানা নেই। তবে ভরসা করি, পেয়েছিলেন। কারণ, নাম তাঁর যাই হোক-না কেন, তাঁর লেখা কবিতা পড়লে অনেকেরই যে মন গলে যাবে তা নির্ভয়ে বলতে পারি।

প্রসিদ্ধ আলংকারিক বিশ্বনাথ কবিরাজ এঁর রচিত একটি শ্লোক তাঁর সাহিত্যদর্পণ পুঁথিতে উদ্ধার করেছেন :

সঙ্গমবিরহবিকল্পে বরমিহ বিরহো ন সঙ্গমস্তস্যাঃ।
সঙ্গমে সৈব তথৈকা ত্রিভুবনমপি তন্ময়ং বিরহে॥

এর মর্মার্থ : প্রিয় বাঞ্ছিতার সঙ্গ পাব কি না-পাব এই সংশয়ক্ষেত্রে আমি আর দ্বিধা করব না, না-পাওয়াকেই শ্রেয় বলে মেনে নেব। কারণ, কাছে থাকলে তাঁকেই কেবল তাঁর মধ্যে পেয়ে থাকি; কিন্তু বিচ্ছেদ-কালে সর্বত্রই তাঁর সত্তাকে অনুভব করি।

শরীর ও নাম সংক্রান্ত সুলক্ষণ-কুলক্ষণ দেখার পর কন্যার কুল সম্বন্ধেও একটু সন্ধান নেওয়ার প্রয়োজন। মনু বলেছেন :

মহান্ত্যপি সমৃদ্ধানি গোঽজাবিধনধান্যতঃ।
স্ত্রীসম্বন্ধে দশৈতানি কুলানি পরিবর্জয়েৎ॥
হীনক্রিয়ং নিষ্পুরুষং নিশ্ছন্দো রোমশার্শসম্।
ক্ষয্যাময়াব্যপস্মারিশ্বিত্রিকুষ্ঠিকুলানি চ॥

—মনুসংহিতা, ৩ অধ্যায়, ৬-৭ শ্লোক

অর্থাৎ, যে কুলে দশ-সংস্কারের অনুষ্ঠান নেই, যে কুলে পুত্রসন্তান না

হয়ে কেবলই কন্যাসন্তান জন্মায়, যে কুলে শাস্ত্রপাঠাদি হয় না, যে কুলের লোকেদের শরীর লোমে পরিপূর্ণ, যে কুলে ক্ষয়রোগ আমাশয় অপস্মার শ্বেতী অর্শ ও কুষ্ঠব্যাধি আছে, এই রকম দশ কুলের কন্যা বিবাহব্যাপারে পরিত্যাজ্য। সেসব কুল গোধনে ও ধান্যে অতি সমৃদ্ধিশালী হলেও সেখান থেকে স্ত্রী গ্রহণ করা উচিত নয়।

বিবাহব্যাপারে শুভাশুভের আজকাল একটা পরীক্ষা হয় জ্যোতিষ-গণনা করে। বিবাহের পূর্বে গণৎকাররা কোষ্ঠী দেখে বলে দেন, বরের সঙ্গে কনের যোটক কি প্রকারের; তাতে বিবাহের ফল শুভ হবে কি অশুভ হবে। তবে অনেক ক্ষেত্রে দেখা গেছে কোষ্ঠী অনুসারে যোটক ভালো জুটে গেলেও বিয়ের ফল তত ভালো হয় নি। তখন সেই মামুলি ওজর, কোষ্ঠী ঠিক নেই লগ্ন ঠিক নেই সন-তারিখ জাতকের জন্মের দিনক্ষণ ঠিক নেই, ইত্যাদি। কোষ্ঠীগণনা করে যে নিশ্চয় কিছু বলা যায় না, এ কথা কিন্তু ভুলেও কেউ বলেন না।

আরো প্রাচীনকালে শুভাশুভের লক্ষণ-বিচার এক অতি অদ্ভুত উপায়ে হত। পরীক্ষাটা কন্যা বন্ধ্যা হবেন কি না-হবেন, তাই নিয়ে। গৃহ্যসূত্রকার আশ্বলায়ন বলছেন :

দুর্বিজ্ঞেয়াতি লক্ষণানীতি

অর্থাৎ, অন্তর্মধ্যস্থিত লক্ষণ জানা অতিশয় কঠিন ব্যাপার।

এটা অবশ্য আমরাও বুঝি। তাইতেই তো এক মজার খেলার উদ্ভব হয়েছিল। ব্যাপারটা এইরকম: বিভিন্ন জায়গা থেকে আটটা মাটির ঢেলা এনে, তাদের মন্ত্রপূত করে কন্যার সামনে ধরা হত। তার পর কন্যাকে তাদের মধ্যে থেকে যেটা ইচ্ছে একটা ঢেলা ছুঁতে বলা হত। সেই ঢেলা-ছোঁয়া থেকেই নাকি বোঝা যেত, মেয়ে বন্ধ্যা হবেন কি সন্তানবতী হবেন। এই খেলার কথা স্মৃতিশাস্ত্রের কোথাও উল্লেখ

নেই। সুতরাং বোঝা যাচ্ছে, স্মৃতির আমলের আগেই এই ছেলেমানুষি কাণ্ডটা উঠে গিয়েছিল।

ফুলফল পশুপক্ষী জলবায়ু, এসবের গতির দ্বারা বিবাহে শুভাশুভের লক্ষণবিচার এখনো ভারতবর্ষের অনেক অঞ্চলে, বিশেষ করে আদিবাসী ও নানা উপজাতির মধ্যে, প্রচলিত আছে। এই ছোটো প্রবন্ধে সেসবের কথা নিয়ে আলোচনা করার সুযোগ নেই।

আজকালকার দিনে ভদ্রসমাজে কনের বাপের যৌতুক দেবার ক্ষমতা দেখেই সাধারণতঃ কনের সুলক্ষণ-কুলক্ষণ বিচার করা হয়। সুতরাং, অন্য-সব লক্ষণের কথা এখন অবান্তর।

সুলক্ষণা পাত্রী স্থির হলে তার পর বিবাহ-অনুষ্ঠান। সকলেই জানেন, হিন্দু বিবাহে অনেকগুলি আচার পালন করার ব্যবস্থা আছে। এদের এক অংশ শাস্ত্রীয়, আর-এক অংশকে বলা হয়, স্ত্রী-আচার কি গ্রাম্য আচার কিংবা লোকাচার। বিবাহকর্ম থেকে স্ত্রীজাতিকে একেবারে বাদ দেওয়া কঠিন। সুতরাং মেয়েরা যে বিয়ের আসরে অনেক খানি জায়গা জুড়ে জাঁকিয়ে বসে থাকবেন, তাতে আর আশ্চর্যের কি ?

কিন্তু এই স্ত্রী-আচার ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশে ভিন্ন ভিন্ন রকমের। এমন-কি একই প্রদেশের এক এক অঞ্চলেও এক এক প্রকারের। শুধু তাই হলে তো রক্ষা ছিল। নানা জাতি উপজাতি বর্ণ সম্প্রদায় এমন-কি নানা পরিবারের মধ্যেও আবার নানা রকমের স্ত্রী-আচার দেখা যায়। ভারতবর্ষে প্রচলিত সমস্ত স্ত্রী-আচার একত্র সংগ্রহ করে বই আকারে এখনো কেউ প্রকাশ করেন নি। করলে, দেখতে পাওয়া যেত তার থেকে এমন সব বিচিত্র তত্ত্ব ও তথ্য বেরোচ্ছে, যার মূল্য অসামান্য।

শাস্ত্রীয় আচার কিন্তু ভারতবর্ষের সর্বত্র প্রায় একই রকমের। পুরাকালে ব্রাহ্মণদের হাতে যখন বেশি কাজকর্ম ছিল না তখন তাঁরা ভেবে ভেবে অনেক রকমের কূটকচালে আচার-অনুষ্ঠানের সৃষ্টি করেছিলেন। গৃহ্যসূত্রের পুঁথিগুলোর উপর শুধু একবার চোখ বুলিয়ে গেলেই দেখা যাবে, এক বিয়ের দিনেই পাদ্য অর্ঘ আসন মধুপর্ক ইত্যাদি দিয়ে বরার্চনা করার থেকে আরম্ভ করে উদ্বাহ অর্থাৎ বরের বাড়ি কনের যাওয়া পর্যন্ত, প্রায় পঁচিশ তিরিশ রকমের আচরণীয় ক্রিয়া আছে। পরবর্তীকালের পদ্ধতিপুস্তকগুলোতে এদের বাড়িয়ে চাড়িয়ে প্রায় চল্লিশের কোঠায় তোলা হয়েছে।

শোনা যায়, সনাতনীরা নাকি এখনো সবক'টা আচারেরই অনুষ্ঠান করে থাকেন। কিন্তু যাঁদের হাতে কাজ বেশি তাঁরা এগুলোকে অনেক সংক্ষেপ করে এনেছেন। বাংলাদেশে ভবদেবভট্টের পদ্ধতিরই প্রচলন। তা ছাড়া, স্মার্ত রঘুনন্দন ভট্টাচার্যের আঠাশ রকমের তত্ত্বের মধ্যে উদ্বাহতত্ত্ব ও সংস্কারতত্ত্ব কেবল পূর্বাঞ্চলের কতক জায়গায় ছাড়া, বাংলাদেশের আর সর্বত্র এ সম্বন্ধে প্রমাণগ্রন্থ।

বিবাহের এত রকমের আচার-অনুষ্ঠান দেখে, একটা প্রশ্ন বার বার উঠেছে। প্রশ্নটা এই: বিবাহ-ব্যাপারে কোন্ কোন্ আচার অবশ্য পালনীয়, অর্থাৎ কোন্ কোন্ আচার অনুষ্ঠিত না হলে বিবাহ অসিদ্ধ হয়। জজেরা তাঁদের রায়ে এ প্রশ্নের সর্বদাই এক বাঁকা জবাব দিয়েছেন। বোধ হয়, লোকদের আরো বিভ্রমে না-ফেলে তাঁরা কৌশলে প্রশ্নটা এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করেছেন। তাঁরা বলেছেন, বিবাহ হয়েছে এইটে প্রমাণ হলেই নিশ্চিন্তে ধরে নেওয়া যেতে পারে যে, সব আচারেরই অনুষ্ঠান হয়েছে। অর্থাৎ, তখন আর আচারের বিচার নিয়ে মাথা ঘামিয়ে কোনো লাভ নেই। কিন্তু সেই সঙ্গে তাঁরা এও বলেছেন যে,

হিন্দু বিবাহে একটা কোনো শাস্ত্রীয় আচারের অনুষ্ঠান হওয়া চাইই চাই।

হিন্দু-আচারে প্রথমেই বিবাহের জন্যে শুভ মাস শুভ দিনক্ষণ দেখার একটা রীতি আছে। আগেকার কালে বাংলাদেশে পৌষ ও চৈত্র মাস বাদ দিয়ে বাকি সব মাসগুলোতেই স্বচ্ছন্দে বিবাহ করা যেত। কালক্রমে শুধু বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ অগ্রাণ মাঘ ফাল্গুন, এই পাঁচ মাস বিবাহের পক্ষে শুভ মাস বলে ধার্য হল। এখন আষাঢ় শ্রাবণ মাসও ভালো মাসের মধ্যে গিয়ে পড়েছে। আবার, ভাদ্র আশ্বিন কার্তিক, পৌষ ও চৈত্রের মতো, অচল মাস হয়ে দাঁড়িয়েছে। তবে বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে শুভ অশুভ মাস সম্বন্ধে লোকের মনে ভিন্ন ভিন্ন রকমের ধারণা। কিন্তু সকলেরই মতে অরক্ষণীয়া কন্যার সম্বন্ধে শুভ মাস ইত্যাদি দেখার কোনো প্রয়োজন নেই, দিয়ে ফেলতে পারলেই হল। বিবাহের শুভ দিন শুভ লগ্ন শুভ যোগ ইত্যাদি যে-কোনো পাঁজি খুললেই দেখতে পাওয়া যাবে। সে সম্বন্ধে আলোচনা নিষ্প্রয়োজন।

স্মার্ত ভট্টাচার্যের মতে বিবাহ সন্ধ্যা কি রাত্রিকালেই অনুষ্ঠিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। বাংলাদেশে তাই হয়েও থাকে। তবে বাংলার বাইরে কোথাও কোথাও নাকি দিনমানেই বিবাহকর্ম সমাধা করে নেওয়া হয় বলে শুনেছি, স্বচক্ষে দেখি নি। এতদ্দেশীয় মুসলমান ও খ্রীস্টানদের মধ্যে দিবাভাগে বিবাহ-অনুষ্ঠান সম্পন্ন করার রীতি প্রচলিত আছে।

অশৌচ অবস্থায় বিবাহ করাটা অশাস্ত্রীয় কাণ্ড। কেউ যে কোথাও করেছেন তা বলে তো শুনি নি।

ভবদেবভট্টের পদ্ধতিপুস্তক ও রঘুনন্দন ভট্টাচার্যের সংস্কারতত্ত্ব মিলিয়ে বাংলাদেশের বিবাহকর্মে অনুষ্ঠেয় শাস্ত্রীয় আচারের একটা সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিচ্ছি।

বিয়ের দিন সকালবেলায় কনের বাপ কিংবা তাঁর অনুপস্থিতিতে অন্য কেউ, অর্থাৎ যিনি কন্যা সম্প্রদান করবেন তিনি, বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ করেন। বৃদ্ধিশ্রাদ্ধের বা আভ্যুদয়িক শ্রাদ্ধের আর-এক নাম নান্দীমুখশ্রাদ্ধ। শুভকর্মের আরম্ভে পিতৃপুরুষদের শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করে, তাঁদের কাছে মঙ্গল ও সমৃদ্ধি প্রার্থনা করার রীতি ভারতবর্ষে সেই মান্ধাতার আমল থেকেই চলে আসছে। আর সমস্ত শুভ কর্মে উপবাস করা, এও ভারতবর্ষে এক সাধারণ নিয়ম। তবে বিবাহ-অনুষ্ঠানের পূর্বে জল সইতে যাওয়া, গায়ে হলুদ প্রভৃতি যেসব মেয়েলি কাণ্ড আছে সেগুলো শাস্ত্রীয় আচার মোটেই নয়।

সন্ধ্যার সময় বর বাদ্যভাণ্ড পাত্রমিত্র নাপিত-পুরোহিত সঙ্গে নিয়ে কনের বাড়ি উপস্থিত হন। বিবাহকর্ম শুরু করার আগে তাঁকে পাদ্য অর্ঘ মধুপর্ক (মধু, ঘি ও দইয়ের একটা মিশ্রপদার্থ) আচমনের জল কুশাসন প্রভৃতি দিয়ে অর্চনা করা হয়। অর্চনা করার পর তাঁর হাতে সবস্ত্রা সালংকারা অক্ষতা কন্যাকে সমর্পণ, অর্থাৎ কন্যাসম্প্রদান।

এই কন্যাসম্প্রদান জিনিসটাকে কিন্তু আজকালকার মেয়েরা দু চক্ষে দেখতে পারেন না। শুনেছি, তাঁরা নাকি নিজেদের মধ্যে বলাবলি করে থাকেন : আমরা কি গোরু ঘোড়া তৈজসপত্তর বাক্স-পেটরার শামিল যে, এক হাত থেকে অন্য হাতে হস্তান্তর করলেই হল ? কিন্তু কন্যাসম্প্রদান না হলে হিন্দুবিবাহ যে কি করে হয় তাও তো ঠিক বুঝে উঠতে পারি নে। সম্প্রদানের কোনো ব্যবস্থা নেই বলেই তো গান্ধর্ব রাক্ষস ও পৈশাচ বিবাহ, হিন্দু স্মৃতিশাস্ত্রে অভদ্র বিবাহের পর্যায়ে গিয়ে পড়েছে।

এই সময় বর কামদেবতার স্তুতি করে একটি শ্লোক আওড়ান। আওড়ান মানে পুরুত আউড়িয়ে চলেন, বর হুঁ-হাঁ করে তাতে সায় দিয়ে যান। শ্লোকটি যজুর্বেদের একটি মন্ত্র :

ক ইদং কোঽদাৎ। কামোঽদাৎ। কামায়াদাৎ।
কামো দাতা। কামঃ প্রতিগৃহীতা। কামঃ সমুদ্রমাবিশৎ।
কামেন ত্বা প্রতিগৃহ্ণামি কামৈতত্তে॥

—বাজসনেয়িসংহিতা, ৭।৪৮

অর্থাৎ, এই কন্যা আমায় কে দিল? কামদেবতা দিলেন। প্রেমের দেবতা প্রেমকেই এই কন্যা প্রদান করলেন। কামদেবতাই দাতা, আবার কামদেবতাই প্রতিগ্রহীতা। প্রেম যে আসমুদ্র আবিষ্ট হয়ে আছে। কাম, তুমি প্রেমের দেবতা, এই কন্যা তোমারই।

এর পর সম্প্রদানকর্তা বরকে উপযুক্ত দক্ষিণা প্রদান করলেই সম্প্রদানপর্ব শেষ হল। সেকালে পতিপুত্রবতী সৌভাগ্যময়ী পুরনারীরা সম্প্রদানের পর বাইরে এসে বরের উত্তরীয়ের এক অংশ কন্যার বস্ত্রাঞ্চলের সঙ্গে গ্রন্থিবন্ধন করে দিতেন। কুন্তীদেবী দ্রৌপদীকে যা বলে আশীর্বাদ করেছিলেন তাই বলে কন্যাকে আশীর্বাদ করতেন:

যথা শচী মহেন্দ্রস্য স্বাহা চৈব বিভাবসৌ।
রোহিণী চ যথা সোমে দময়ন্তী যথা নলে॥
যথা বৈশ্রবণে ভদ্রা বশিষ্ঠে চাপ্যরুন্ধতী।
যথা নারায়ণে লক্ষ্মী স্তথা তং ভব ভর্তরি॥

—মহাভারত, আদিপর্ব, ১৯৯ অধ্যায়, ৫-৬ শ্লোক

অর্থাৎ, শচী যেমন ইন্দ্রের, স্বাহা যেমন অগ্নির, রোহিণী যেমন চন্দ্রের, দময়ন্তী যেমন নলের, ভদ্রা যেমন কুবেরের, অরুন্ধতী যেমন বশিষ্ঠের, লক্ষ্মী যেমন বিষ্ণুর, তেমনি তুমিও তোমার পতির সহচারিণী হও।

পুরস্ত্রীর বদলে এখন পুরুতবামুনরাই এই কাজটি সেরে দেন।

কিন্তু বিয়ে এখানে মোটেই শেষ হল না। এখনো অনেক-কিছু বাকি। এর পর কুশণ্ডিকা। এই অনুষ্ঠান কোথাও বিয়ের রাত্রেই

সম্পন্ন হয়, কোথাও আবার তার পরের দিনে। কোথাও কনের বাড়িতে, কোথাও বরের বাড়িতে। যেখানে যেমন কুলপ্রথা।

কুশণ্ডিকা মানে, চারিদিকে কুশের গণ্ডি করে তাতে অগ্নিসংস্কার করা। অগ্নিসংস্কার করে সেই অগ্নিতে খই আহুতি দিলেই লাজহোম বা বৈবাহিক হোম। কুশণ্ডিকার মধ্যে কয়েকটি বিশেষ বিশেষ ক্রিয়া আছে। পাণিগ্রহণ অশ্মারোহণ ও সপ্তপদীগমন তাদের মধ্যে প্রধান। পাণিগ্রহণ মানে যে বিবাহ, তা বোধ করি সকলেরই জানা আছে। বর কনের হাত ধরে কন্যাসম্প্রদানকে যে স্বীকার করে নিলেন, শুদ্ধ ভাষায় তারই নাম পাণিগ্রহণ। তারপর অশ্মারোহণ। এই ক্রিয়ায় একটা পাথরের শিলের উপর কনেকে চড়িয়ে দেওয়া হয়। তাৎপর্য এই যে, কন্যা যেন শিলার মতোই দৃঢ় হয়ে স্বামীর শত্রুবিনাশ করতে থাকেন। সব শেষে সপ্তপদীগমন। হোমকুণ্ডের চার ধারে বরকন্যার এক সঙ্গে এক-পা এক-পা করে সাত পা ফেলে প্রদক্ষিণ।

আরো একটু আছে। বিবাহের পর উত্তর-বিবাহ। ওষুধের সঙ্গে যেমন তার অনুপান। এই অনুষ্ঠানে বর, কন্যাকে অরুন্ধতী ধ্রুবতারা সপ্তর্ষিমণ্ডল দেখিয়ে বধূকে ধ্রুব হতে উপদেশ দেন। আর সেই সঙ্গে সিন্দুরদান করেন। অর্থাৎ, বর নিজের হাতে একটা আংটি কি শলার সাহায্যে বধূর সিঁথিতে সিঁদুর পরিয়ে দেন।

সিঁদুর ও একটা লোহার বালা ধারণ এ-দেশে এয়োতির চিহ্ন বলে অনেকদিন থেকেই মান্য হয়ে আসছে। কিন্তু বলে রাখা উচিত, এই দুটোই অশাস্ত্রীয় কাণ্ড। কোনো প্রাচীন শাস্ত্রগ্রন্থে এদের উল্লেখ পাওয়া যায় না। নৃতত্ত্ববিদ পণ্ডিতেরা অনুমান করেন, এ দুটোই বহু প্রাচীন কালের কন্যাহরণ করে যে বিবাহ হত, তারই একটা প্রতীক মাত্র। হরণকালে মাথা ফাটাফাটিতে যে রক্তপাত হত, তারই চিহ্ন নাকি

সিঁদুর। আর, যাতে পালাতে না পারেন তার দরুণ কন্যার হাতে যে লোহার বেড়ি বেঁধে দেওয়া হত, তারই চিহ্ন নাকি লোহা। হতেও পারে। তা হলে সিন্দুর-দান অনুষ্ঠানকে লোকাচারেরই মধ্যে ফেলা যাক। তা সে যাই হোক, আজকালকার অনেক বধূই মাথাগরম হবার ভয়ে, সিঁথেয় সিঁদুর পরেন না। লোহার বালার উপর সোনার পাত মুড়ে লজ্জানিবারণ করে থাকেন।

এর পর বর-কনের এক সঙ্গে বরের বাড়ি যাত্রা। বরের বাড়ি গিয়েও কনের নিস্তার নেই। সেখানেও আবার অনেক রকমের আচার-অনুষ্ঠান। তবে সেগুলো ঠিক বিবাহের আচার নয়, উৎসবের অঙ্গ মাত্র। সেগুলোর অধিকাংশ শাস্ত্রীয় ক্রিয়াও নয়। বিয়ে তো আগেই কনের বাড়িতে হয়ে গেছে। কালরাত্রি ফুলশয্যা বউভাত ইত্যাদি পর্ব লোকাচারেরই অন্তর্গত। সেসব আবার বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন রকমের। কোথাও অনুষ্ঠিত হয়, কোথাও বা হয় না।

বাংলাদেশে সামবেদীয় লোকই বেশি। ঋগ্‌বেদীয় কালেভদ্রে কখনো দেখতে পাওয়া যায়। যজুর্বেদীয় দুষ্প্রাপ্য। সুতরাং সামবেদীয় বিবাহ-আচারই বর্ণনা করলুম। ঋগ্‌বেদীয় ও যজুর্বেদীয় আচার সামবেদীয় আচারের থেকে কতক কতক জায়গায় তফাত হয়ে থাকে, বিশেষ করে মন্ত্র ও মন্ত্রপাঠের ক্রমে।

মজার কথা এই যে, বরার্চনা ও সম্প্রদানের মধ্যে বৈদিক মন্ত্র নামমাত্র। যা-কিছু ভালো বৈদিক মন্ত্র আছে, তা ঐ কুশণ্ডিকার অন্তর্গত নানা ক্রিয়ার অনুষ্ঠানের সঙ্গেই উচ্চারণ করা হয়ে থাকে। বিয়ে তো অনেকেই করেছেন, কিন্তু এই মন্ত্রগুলো ক'জনের মনে আছে? অবশ্য মনে থাকবার কথা নয়। দু পক্ষের পুরুতবামুনেরা ঝগড়া করতে করতে এমনি হড়বড়-তড়বড় করে মন্ত্র পড়িয়ে যান যে, শুধু একটা

অং-বং শব্দই কানে আসে, তার মানে বোঝা বরের কেন, বরের বাপেরও সাধ্যে কুলোয় না।

কিন্তু মন্ত্রগুলো জেনে রাখা ভালো। হিন্দু আইনের নববিধানে বিয়ের যে সংক্ষিপ্ত মন্ত্রের সৃষ্টি হয়েছে, তা শুনে পুরনো মন্ত্রগুলো লজ্জায় লাল হয়ে দূরে পালিয়ে যাবে। নব্যসমাজের বিবাহের মন্ত্র অনুসারে বর কনেকে বলবেন : আমি তোমাকে আমার বৈধ পত্নী রূপে গ্রহণ করলুম। কনে বরকে বলবেন : আমি তোমাকে আমার বৈধ পতি রূপে গ্রহণ করলুম। ব্যস্! সব হয়ে-বয়ে চুকে গেল।

তা হলে দেখা যাক, বৈদিক মন্ত্রগুলো কি রকমের। এখানে লক্ষ্য করার বিষয় এই যে, এই মন্ত্রগুলির প্রায় সবটাই বরের উক্তি। বৈদিক মতে বিবাহে পুরুষই মুখ্য, স্ত্রী গৌণ। হিন্দুসমাজেও পুরুষেরই প্রাধান্য এতদিন ধরে চলে এসেছে। কিন্তু আর বেশি দিন নয়, স্ত্রীতন্ত্র এল বলে। তবে এর অন্য আর-একটা কারণও থাকতে পারে। শোনা যায়, স্ত্রীজাতি নাকি প্রকৃতির অংশ। তাই পুরাকালে তাঁরা সংস্কৃত না ব'লে প্রাকৃতই ব্যবহার করতেন বেশি। তাঁদের মুখে এই সংস্কৃত মন্ত্রগুলি তত ভালো খুলবে না মনে করেই বোধ হয় তো এই বিধান। মন্ত্রগুলি এই :

সমঞ্জন্তু বিশ্বে দেবাঃ সমাপো হৃদয়ানি নৌ।
সম্মাতরিশ্বা সংধাতা সমুদ্রেষ্ট্রী দধাতু নৌ॥

—ঋগ্‌বেদসংহিতা, ১০ মণ্ডল, ৮৫ সূক্ত, ৪৭ ঋক্

অর্থাৎ, দেবতাসকল আমাদের পরস্পরের হৃদয় পরস্পরের কাছে উন্মুক্ত করুন। অনুকূল জলবায়ু আমাদের উভয়কে মিলিত করুক। দেবী সরস্বতী আমাদের যথোচিত উপদেশ প্রদান করুন।

গৃভ্ণামি তে সৌভগত্বায় হস্তং ময়া পত্যা জরদষ্টির্যথাসঃ।
ভগো অর্যমা সবিতা পুরংধির্মহ্যং ত্বাদুর্গার্হপত্যায় দেবাঃ॥

—ঋগ্‌বেদসংহিতা, ১০ মণ্ডল, ৮৫ সূক্ত, ৩৬ ঋক্

অর্থাৎ, আমি তোমার পতি। সৌভাগ্যলাভের নিমিত্ত আমি তোমার পাণিগ্রহণ করছি। তুমি আমার সঙ্গে বৃদ্ধত্ব প্রাপ্ত হও। অর্যমা পরম ঐশ্বর্যশালী সবিতা ও পূষা—এই দেবতারা তোমাকে আমার হাতে সমর্পণ করেছেন, যাতে আমি গৃহস্থ হয়ে তোমার সঙ্গে গৃহকার্য সুসপন্ন করতে পারি।

অঘোরচক্ষুরপতিঘ্ন্যেধি শিবা পশুভ্যঃ সুমনাঃ সুবর্চাঃ।
বীরসূর্দেবকামা স্যোনা শং নো ভব দ্বিপদে শং চতুষ্পদে ॥

—ঋগ্‌বেদসংহিতা, ১০ মণ্ডল, ৮৫ সূক্ত, ৪৪ ঋক্

তোমার চক্ষু ভয়ক্রোধহীন হয়ে সৌম্যদৃষ্টি হোক। তুমি পতির অনিষ্টকারিণী হোয়ো না। তুমি জীবগণের মঙ্গলকারিণী হও। তোমার মন যেন সর্বদা প্রফুল্ল থাকে। তুমি তেজস্বিনী হও, বীর-প্রসবিনী হও। ঈশ্বরপরায়ণা হয়ে তুমি মনুষ্য ও পশুকুলের হিতকারিণী হয়ে থাকো।

সম্রাজ্ঞী শ্বশুরে ভব সম্রাজ্ঞী শ্বশ্র্বাং ভব।
ননান্দারি চ সম্রাজ্ঞী সম্রাজ্ঞী অধিদেবৃষু॥

—ঋগ্‌বেদসংহিতা, ১০ মণ্ডল, ৮৫ সূক্ত, ৪৬ ঋক্

তুমি শ্বশুর শাশুড়ী ননদ দেবর সকলের কাছেই সম্রাজ্ঞীর মতো শোভমানা হয়ে অধিষ্ঠিত থাকো।

মম ব্রতে তে হৃদয়ং দধাতু মম চিত্তম্ অনুচিত্তং তে অস্তু।
মম বাচম্ একমনা জুষস্ব প্রজাপতিষ্টা নিযুনক্তু মহ্যম্॥

—সামমন্ত্রব্রাহ্মণ, ১।২।২১

আমার কর্তব্যে তুমি হৃদয় নিবিষ্ট কর। তোমার মন যেন আমার মনের অনুকূল হয়। একমন হয়ে তুমি আমার বাক্য প্রতিপালন কর। প্রজাপতি তোমাকে আমার প্রতি অনুরক্ত রাখুন।

ধ্রুবা দ্যৌ ধ্রুবা পৃথিবী ধ্রুবং বিশ্বমিদং জগৎ।
ধ্রুবাসঃ পর্বতা ইমে ধ্রুবা পতিকুলে ইয়ম্॥

—সামমন্ত্রব্রাহ্মণ, ১।৩।৭

ধ্রুব দ্যুলোক, ধ্রুব পৃথিবী, ধ্রুব এই বিশ্বজগৎ। এই পর্বতসকলও ধ্রুব। এই বধূ তাঁর পতিকুলে ধ্রুব।

বধ্নামি সত্যগ্রন্থিনা মনশ্চ হৃদয়ঞ্চতে।
যদেতদ্ হৃদয়ং তব তদস্তু হৃদয়ং মম।
যদেতদ্ হৃদয়ং মম তদস্তু হৃদয়ং তব॥

—সামমন্ত্রব্রাহ্মণ, ১।৩।৮-৯

আমি সত্যরূপ গ্রন্থির দ্বারা তোমার মন ও হৃদয়কে বন্ধন করছি। আমাদের পরস্পরের হৃদয় পরস্পরের সঙ্গে একই হৃদয় হয়ে থাকুক।

সুমঙ্গলীরিয়ং বধূরিমাং সমেত পশ্যত।
সৌভাগ্যমস্যৈ দত্ত্বা যাথাস্তং বি পরেতন॥

—ঋগ্বেদসংহিতা, ১০ মণ্ডল, ৮৫ সূক্ত, ৩০ ঋক্

এই সুকল্যাণী বধূকে আপনারা নিকটে এসে দর্শন করুন। ইঁহাকে সৌভাগ্যলাভের আশীর্বাদপূর্বক আপনারা স্বগৃহে প্রত্যাগমন করবেন।

এখন সপ্তপদীগমনের মন্ত্র :

ইষে একপদী ভব সা মামনুব্রতা ভব।

অন্নলাভের জন্য প্রথম পদ নিক্ষেপ কর, এবং তুমি আমার অনুগামিনী হও।

ঊর্জে দ্বিপদী ভব সা মামনুব্রতা ভব।

বললাভের জন্য দ্বিতীয় পদ নিক্ষেপ কর, এবং তুমি আমার অনুগামিনী হও।

রায়স্পোষায় ত্রিপদী ভব সা মামনুব্রতা ভব।

ধনলাভের জন্য তৃতীয় পদ নিক্ষেপ কর, এবং তুমি আমার অনুগামিনী হও।

মায়োভবায় চতুষ্পদী ভব সা মামনুব্রতা ভব।

সুখলাভের জন্য চতুর্থ পদ নিক্ষেপ কর, এবং তুমি আমার অনুগামিনী হও।

ঋতুভ্যঃ ষট্‌পদী ভব সা মামনুব্রতা ভব।

ঋতুগণ যাতে আমাদের অনুকূল হয় সেই জন্য ষষ্ঠ পদ নিক্ষেপ কর, এবং তুমি আমার অনুগামিনী হও।

সখা সপ্তপদী ভব সা মামনুব্রতা ভব।

আমাদের পরস্পর সখ্যের জন্য সপ্তম পদ নিক্ষেপ কর, এবং তুমি আমার অনুগামিনী হও।

সখা সপ্তপদী ভব সখ্যন্তে গময়ং।
সখ্যন্তে মা যোষাঃ সখ্যন্তে মা যোষ্ঠ্যাঃ ॥

সুখলাভের জন্য তুমি আমার সঙ্গে সপ্ত পদ গমন করলে। এখন কল্যাণময়ী বধূরা আমাদের সখ্য দৃঢ়ভাবে বন্ধন করে দিন। অপর কোনো নারী যেন আমাদের এই সখ্যবন্ধন ছিন্ন করতে না পারেন।

—আশ্বলায়ন গৃহ্যসূত্র, ১।৭।১৯

আর্য পিতামহদের পার্থিব বস্তুর দিকেও যে বেশ দৃষ্টি ছিল, তা এই সপ্তপদীগমনের মন্ত্র থেকেই স্পষ্ট বোঝা যায়। সপ্তপদীগমন শেষ হলে কন্যা উপস্থিত ব্রাহ্মণদের ও গুরুজনদের প্রণাম জানিয়ে সব শেষে বরকে অভিবাদন করেন। আসল বিবাহকর্ম এই খানেই শেষ।

শাস্ত্রমতে সপ্তপদীগমনের শেষ পা ফেললেই হিন্দু বিবাহ সম্পূর্ণ হয়ে গেল। তখন এক যমরাজ ছাড়া, স্বয়ং ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর কেউ এসেও সে বিবাহকে বিচ্ছিন্ন করতে পারেন না। তবে সপ্তপদীগমন শেষ হবার আগে পর্যন্ত কিন্তু বিয়ে ভেঙে যেতে পারে। অবশ্য ওরকম ভাঙাটা কিছু শুভ ঘটনা নয়। কুশণ্ডিকার সময় কারো যে বিয়ে ভেঙে গেছে, এমন খবর আমার কানে আসে নি। কিন্তু সম্প্রদানের পিঁড়িতে-বসা বরকে উঠিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে, এরকম একটা

ব্যাপার আমার স্বচক্ষে দেখা। এ ক্ষেত্রে পাছে কনে দ'-পড়া হয়ে যান সেই ভয়ে, তৎক্ষণাৎ আর-এক বর ধরে এনে সেই লগ্নেই নতুন বরের হাতে কন্যাসম্প্রদান করে দেওয়া হয়েছিল। তাতে শেষ পর্যন্ত ফল যে কিছু খারাপ ফলেছিল, তা নয়।

মনু বলেছেন:

পাণিগ্রহণিকা মন্ত্রা নিয়তং দারলক্ষণম্।
তেষাং নিষ্ঠা তু বিজ্ঞেয়া বিদ্বদ্ভিঃ সপ্তমে পদে ॥

—মনুসংহিতা, ৮ অধ্যায়, ২২৭ শ্লোক

পাণিগ্রহণের মন্ত্রপাঠই সর্বদা কন্যার ভার্যাত্বে পরিণীত হবার সুনির্দিষ্ট লক্ষণ। শাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তিরা জানেন যে, সপ্তপদীগমনের সপ্তম পদ নিক্ষেপের সঙ্গে সঙ্গে মন্ত্র উচ্চারণ হয়ে গেলেই বিবাহ সুপ্রতিষ্ঠিত হল।

মেধাতিথি বলেছেন, এর পূর্বে কন্যা কন্যাই থাকেন, অর্থাৎ তখনো ভার্যা হন না। যম বশিষ্ঠ নারদ প্রভৃতি বড়ো বড়ো মুনিরাও এই একই রায় দিয়ে গেছেন। বাংলাদেশের স্মার্ত ভট্টাচার্যেরও ঐ এক মত। এইসব শাস্ত্রবাক্য শুনেই বোধ হয়, ইংরেজি আমলের জজেরাও সপ্তপদীগমনকেই হিন্দু বিবাহের প্রধান অনুষ্ঠান বলে ধরে নিয়েছেন। এবং যেখানে যেখানে রায় দিতে বাধ্য হয়েছেন সেখানে সেখানে বলেছেন, অন্যান্য আচার অনুষ্ঠিত না হলেও তেমন কিছু ক্ষতিবৃদ্ধি নেই, যদি দেখা যায় সপ্তপদীগমনটা করানো হয়েছে। তা হলেই হিন্দু বিবাহ সম্পূর্ণ হয়েছে বলে মেনে নিতে হবে।

আপনারা বোধ হয় এতক্ষণে ধরে নিতে পেরেছেন যে, হিন্দু বিবাহ একবার হয়ে গেলে, তার আর বিচ্ছেদ নেই। হিন্দুমতে বিবাহ যখন একটা সংস্কার মাত্র তখন তাতে আর ছেদ-বিচ্ছেদের কথা ওঠেই বা কি করে? এই কারণে, হিন্দু স্মৃতিতে বিবাহযোগেরই কথা পাওয়া

যায়, বিয়োগের কথা কোনো পুঁথিতে লেখা নেই। আর, গোঁড়া হিন্দু স্ত্রীর মনেও তো দৃঢ় সংস্কার এই দেখি যে, তিনি ইহলোকে যে স্বামী পেলেন, পূর্বজন্মেও তাঁর ঐ স্বামীই ছিলেন। এবং কায়মনে সতী হয়ে থাকলে, জন্মজন্মান্তরেও সেই একই স্বামীকে বার বার স্বামীরূপে ফিরে পাবেন। জন্মান্তররহস্য অতিশয় জটিল ব্যাপার। ও সম্বন্ধে আমার নিজের কোনো সুস্পষ্ট ধারণা নেই। সুতরাং ঐ নিয়ে আর-কিছু আলোচনা করতে গেলে সেটা আমার পক্ষে নিতান্তই অনধিকার চর্চা হবে।

আধ্যাত্মিক দিকটা বাদ দিয়ে শুধু লৌকিক দৃষ্টিতে দেখলে, হিন্দু-সমাজে বিবাহবিচ্ছেদের কোনো প্রয়োজন ছিল বলে তো মনে হয় না। যে সমাজে পুরুষেরা স্বচ্ছন্দে এক সঙ্গে একাধিক বিবাহ করতে পারেন এবং স্ত্রীলোকদের পক্ষে, কি সধবা কি বিধবা কোনো অবস্থাতেই, দ্বিতীয় বার স্বামী গ্রহণ অত্যন্ত গর্হিত কর্ম বলেই বদ্ধমূল সংস্কার, সেখানে কিসের লোভে লোকে বিবাহবিচ্ছেদ ঘটাতে চাইবে? কি কাজে তা লাগবে? সেই জন্যে হিন্দু আইনে স্ত্রীকে ত্যাগ করলেও সেই স্ত্রী স্বামীর জীবন-ভর, এমন-কি তাঁর মৃত্যুর পরও, তাঁরই স্ত্রী থেকে যান। কিছুতেই এর আর ছাড়ান-ছোড়ন নেই। তাই মনু বলেছেন:

> ন নিষ্ক্রয়বিসর্গাভ্যাং ভর্তুর্ভার্যা বিমুচ্যতে।
> এবং ধর্মং বিজানীমঃ প্রাক্ প্রজাপতিনির্মিতম্॥
>
> —মনুসংহিতা, ৯ অধ্যায়, ৪৬ শ্লোক

বিক্রয় কিংবা ত্যাগের দ্বারাও স্বামীর থেকে স্ত্রী মুক্ত হতে পারেন না। গোড়া থেকে স্বয়ং প্রজাপতিই এই ধর্ম বিধান করেছেন—তাই বলেই আমরা জানি।

তবে সেই সঙ্গে কি কি উপযুক্ত কারণে স্ত্রীকে পরিত্যাগ করতে পারা যায়, তার একটা ফিরিস্তি দিতে মনু ভোলেন নি। বলেছেন:

বিধিবৎ প্রতিগৃহ্যাপি ত্যজেৎ কন্যাং বিগর্হিতাম্।
ব্যাধিতাং বিপ্রদুষ্টাং বা ছদ্মনা চোপপাদিতাম্॥

—মনুসংহিতা, ৯ অধ্যায়, ৭২ শ্লোক

মদ্যপাঽসাধুবৃত্তা চ প্রতিকূলা চ যা ভবেৎ।
ব্যাধিতা ব্যাধিবেত্তব্যা হিংস্রাঽর্থঘ্নী চ সর্বদা॥

—মনুসংহিতা, ৯ অধ্যায়, ৮০ শ্লোক

যদি প্রকাশ পায়, স্ত্রী নির্লজ্জ, দুশ্চরিত্র, ক্ষয়রোগগ্রস্ত, কি যেখানে বিবাহের পূর্বে তিনি অপর পুরুষের সংসর্গ করেছেন; কিংবা যদি দেখা যায়, কোনো ছলনার দ্বারা কন্যা পার করা হয়েছে, তা হলে সে কন্যাকে যথাবিধি বিবাহ করা সত্ত্বেও ত্যাগ করতে পারা যায়। আবার স্ত্রী যদি মদ্যপানাসক্ত হন, মিথ্যা ব্যবহার করেন, ব্যভিচারিণী হন, কুষ্ঠাদি রোগগ্রস্ত হন, ভৃত্য আশ্রিত ইত্যাদির প্রতি যদি সতত কর্কশ ব্যবহার করেন, কিংবা সর্বদা যদি স্বামীর অর্থ নষ্ট করেন, তা হলে সে স্ত্রীও পরিত্যাজ্যা।

মনু আরো বলেছেন, যে স্ত্রী বন্ধ্যা কি ক্রমাগত কন্যা-প্রসব করেন, কিংবা সর্বদা অপ্রিয়বাদিনী বা স্বামীর মুখে মুখে চোপা করেন, সে স্ত্রীও ত্যাগের যোগ্য। কিন্তু:

যা রোগিণী স্যাৎ তু হিতা সম্পন্না চৈব শীলতঃ।
সানুজ্ঞাপ্যাধিবেত্তব্যা নাবমান্যা চ কর্হিচিৎ॥

—মনুসংহিতা, ৯ অধ্যায়, ৮২ শ্লোক

যে স্ত্রী রোগগ্রস্ত কিংবা বন্ধ্যা হওয়া সত্ত্বেও পতির হিতকারিণী সুশীলা সাধ্বী তাঁকে কথনই অপমানিত করা উচিত নয়। সুতরাং সেই স্ত্রী বর্তমানে আবার বিবাহ করতে গেলে, তাঁর অনুমতি নেওয়াই কর্তব্য।

মনু কিন্তু স্বামীদের সম্বন্ধে যেন একটু একচোখোমি করেছেন। বলেছেন :

বিশীলঃ কামবৃত্তো বা গুণৈর্বা পরিবর্জিতঃ।
উপচর্য্যঃ স্ত্রিয়া সাধ্ব্যা সততং দেববৎ পতিঃ ॥

—মনুসংহিতা, ৫ অধ্যায়, ১৫৪ শ্লোক

স্বামী জুয়াড়ি সদাচারশূন্য কামুক হলেও এবং কোনো গুণ তাঁর না থাকলেও সাধ্বী স্ত্রী সর্বদাই তাঁকে দেবতার মতো জ্ঞান ক'রে তাঁর পরিচর্যা করবেন।

এতদিন যা হয়ে গেছে, তা হয়ে গেছে। কিন্তু এখন, অর্থাৎ ভারতবর্ষ স্বাধীনতা লাভের পর, এ দেশীয় কোনো স্ত্রীই আর মনুর এই বচন শিরোধার্য করে নেবেন বলে তো বিশ্বাস হয় না। তবে স্ত্রীকে সৎ কারণেও পরিত্যাগ করলে তাঁর ভরণপোষণের একটা ব্যবস্থা নিশ্চয়ই করে দিতে হবে। এটা শাস্ত্রের কথাও বটে, আইনের কথাও বটে।

যাজ্ঞবল্ক্য বলেছেন :

অধিবিন্না তু ভর্তব্যা মহাদেহন্যথা ভবেৎ।
যত্রানুকূল্যং দম্পত্যো স্ত্রিবর্গস্তত্র বর্ধতে ॥

—যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতা, ১ অধ্যায়, ৭৪ শ্লোক

অর্থাৎ, পরিত্যাক্তা স্ত্রীরও যথোপযুক্ত ভরপোষণের ব্যবস্থা না করে দিলে মহাপাপ হয়। যেখানে স্বামী-স্ত্রী পরস্পরের প্রতি অনুকূল সেখানেই ধর্ম অর্থ কাম, এই ত্রিবর্গের ফল বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়।

হিন্দু আইনে বিবাহবিচ্ছেদের ব্যবস্থা এতদিন ছিল না বলেই কাউকে কাউকে নিতান্ত দায়ে পড়ে এ সম্পর্কে একটু কৌশল অবলম্বন করতে হয়েছে। কৌশলটা এই : যে পক্ষ বিবাহবিচ্ছেদ চাইতেন, তিনি খ্রীস্টান কি মুসলমান হয়ে যেতেন। তার পর অপর পক্ষকে উকিলের

চিঠি দিতেন যে, তিনিও যেন খ্রীস্টান কি মুসলমান ধর্ম গ্রহণ ক'রে পূর্বপক্ষের সঙ্গে স্বামী- কি স্ত্রীরূপে একত্র বাস করতে আসেন। অপর পক্ষ সহজে জাতধর্ম খোয়াতে রাজি হন না। সুতরাং এই নিয়ে আদালতে মামলা দায়ের হয়। জজ উকিল কৌঁসুলি সবাই জানেন যে, এটা একটা ফিকির মাত্র। জজ যদি মামলা শুনে বোঝেন যে, ব্যাপার গুরুতর, তা হলে ডিক্রি দিয়ে বিবাহবিচ্ছেদ ঘটিয়ে দেন।

এ রকম দুটি কেস্ করার সুযোগ আমার হয়েছিল। সেই কথা বলি। একটি সুশিক্ষিতা সুন্দরী মহিলার বিবাহ হয়েছিল এক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির সঙ্গে। মহিলার স্বামীর বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল এই যে, তিনি নাকি তাঁর গুরুর কাছে নিজের স্ত্রীকে নিবেদন করে দিয়েছিলেন। স্ত্রী গুরুর সঙ্গে মিলিত হতে রাজি না হয়ে এক সঙ্গেই স্বামী ও গুরু ত্যাগ করে, স্বামীর ঘর ছেড়ে পালিয়ে আসেন। পরে মুসলমানধর্ম গ্রহণ করে স্বামীর বিরুদ্ধে বিবাহবিচ্ছেদের মামলা উপস্থিত করেন। জজ ছিলেন এক ইংরেজ সাহেব। নালিশ শুনেই তো তিনি চমকে উঠে তৎক্ষণাৎ ডিক্রি দিয়ে বিবাহভঙ্গ করে দিলেন। মহিলাটি পরে আর্যসমাজী মতে শুদ্ধ হয়ে আবার হিন্দুধর্ম গ্রহণ করে, হিন্দুমতেই বিবাহিত হয়ে সুখে ঘরকন্না করেছিলেন। আর একটি মহিলার স্বামী পয়সার লোভে নিজের বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে বিবাহিত স্ত্রীকে ব্যভিচারিণী হতে প্রবৃত্ত করাবার চেষ্টায় ছিলেন। সেই মহিলা ঐ একই কৌশল অবলম্বন করে অবশেষে সেই স্বামীর হাত থেকে নিস্তার পান। এঁর পরবর্তী কালের ইতিহাস আমার জানা নেই।

হিন্দুসমাজে বিবাহবিচ্ছেদ যে একেবারে নেই, এ কথা বললে অবশ্য একটু অত্যুক্তি করাই হবে। ভদ্রসমাজে নেই বটে, কিন্তু নিম্নস্তরের সমাজে যথেষ্ট আছে। যেখানে যেখানে অশাস্ত্রীয় বিবাহ প্রচলিত আছে,

কিংবা দ্বিতীয় বার বিবাহ যে সমাজে নিন্দনীয় নয় সেখানে বিবাহ-বিচ্ছেদের প্রথা অনেক দেখা যায়। বাংলাদেশে জাতবোষ্টম কিংবা বৈরাগীদের মধ্যে বিবাহবিচ্ছেদের চল আছে। বোম্বাই প্রদেশে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে ছোড়চিঠি দিয়ে বিবাহ ভঙ্গ করা যায়। মাদ্রাজ উত্তরপ্রদেশ পাঞ্জাব ও আসাম অঞ্চলেও নিম্নশ্রেণীর সমাজে বিবাহ-বিচ্ছেদের প্রথা দেখা যায়। আদিবাসী ও উপজাতিদের মধ্যে অতি সহজেই বিবাহবিচ্ছেদ ঘটানো যায়। কিন্তু আদালতে এই সব সম্পর্কে মামলা উঠলে জজেরা সহজে ওই সব প্রথা মানতে চান না, খুবই ইতস্ততঃ করেন দেখেছি।

বিবাহপ্রসঙ্গে সনাতন হিন্দু আইনে মোটামুটি এই রকম ব্যবস্থা। ইংরেজি আমলে হিন্দুবিবাহের আইন আস্তে আস্তে কি রকম ভাবে যে বদলে গেল এবং আমাদের এই স্বদেশী আমলে যে সে আইন কি রকম চেহারা নিল, এখন সংক্ষেপে তারই একটু পরিচয় দিই।

জ্ঞানীগুণী ও শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত ব্যক্তিরা বলে থাকেন, শ্রুতির পরিবর্তন না থাকলেও কালে কালে স্মৃতির পরিবর্তন অবশ্যই আছে। আমাদের দেশের লোকেরা সব লৌকিক ব্যাপারেই একটা-কিছু আধ্যাত্মিক ভাব টেনে আনেন বলে আমাদের স্মৃতিশাস্ত্রও অর্ধেকের উপর প্রায়শ্চিত্ত-প্রকরণে পূর্ণ। ব্যাবহারিক বিষয়ের অর্থাৎ পুরোপুরি আইন সম্বন্ধীয় বচনগুলো তাই কেমন যেন খাপছাড়া ধরনের। ইংরেজরা আমাদের প্রায়শ্চিত্তবিধি নিয়ে মাথা না ঘামিয়ে একটু মুচকি হেসে, সেটা আমাদের সমাজের প্রধানদের হাতেই ছেড়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু পূর্বেই বলেছি, আমাদের শাস্ত্রের এই ব্যাবহারিক অংশটা ইংরেজ রাজপুরুষদের হাতে পড়ে দো-আঁশলা আকার ধারণ করেছে; এবং স্বাধীনতার পরেও সেই একই সংকর প্রকার চলে যাচ্ছে।

এতক্ষণে নিশ্চয় কারো বুঝতে বাকি নেই, মনু হচ্ছেন স্মৃতিকারদের মধ্যে সর্বপ্রধান। মনুসংহিতার যে পুঁথি আমরা সচরাচর পড়ে থাকি, অর্থাৎ যে পুঁথির টীকা মেধাতিথি প্রভৃতি লিখে গেছেন, সে পুঁথি যে খুব প্রাচীন তা নয়। পণ্ডিতেরা মনে করেন, এটি খুব সম্ভব খ্রীষ্টীয় কালের একেবারে গোড়ার দিকে রচিত। যাজ্ঞবল্ক্যের স্মৃতিও প্রায় ওই সময়কার, সামান্য একটু পরের হবে। তবে পণ্ডিত ব্যক্তিরা এও বলেন যে, প্রচলিত মনুসংহিতার আগে আরো অনেকগুলি মনুসংহিতা ছিল, সেগুলো বহু প্রাচীন, যিশু খ্রীস্ট জন্মাবার অনেক আগে লেখা। কিন্তু সেসব পুঁথি আমাদের হাতে এসে পৌঁছয় নি।

আমার মনে হয়, মনুসংহিতার এত আদর তার টীকাকার মেধাতিথির দরুণ। মেধাতিথির মতো ও রকম সর্বশাস্ত্রে সুপণ্ডিত ভূয়োদর্শী আচার্য বড়ো সহজে চোখে পড়ে না; পণ্ডিতেরা তাঁকে খ্রীষ্টীয় নবম থেকে দশম শতাব্দীর মধ্যেকার লোক বলেই মনে করেন। তিনি উত্তরপ্রদেশের লোক। কেউ কেউ তাঁকে কাশ্মীরী বলেও সন্দেহ করেন।

কিন্তু মনুকে আমরা মুখে মানলেও কাজে লাগাই বেশি করে যাজ্ঞবল্ক্যের স্মৃতিকে। যাজ্ঞবল্ক্যস্মৃতির প্রাধান্য হওয়ার একটা বিশেষ কারণ আছে। ভারতীয় সমাজ যখন নানা কারণে বিধ্বস্তপ্রায় তখন সমাজে অনেক অনাচার দেখা দিয়েছিল। সেই সময় বিজ্ঞানেশ্বর নামে এক দক্ষিণদেশীয় সন্ন্যাসী যাজ্ঞবল্ক্য স্মৃতির উপর একটি টীকা রচনা করেন। তাঁর চেষ্টা ছিল এলোমেলো সমাজকে একটা সুনির্দিষ্ট নিয়মে বদ্ধ করা। বিজ্ঞানেশ্বরের এই টীকার নাম মিতাক্ষরা। এটি যদিও নামে টীকাগ্রন্থ, তবু অনেক জায়গায় আসলে মৌলিক রচনা। অল্পদিনের মধ্যেই চারদিকে এই গ্রন্থের এমন সমাদর হল যে, ভারতবর্ষের উত্তর

দক্ষিণ পূর্ব পশ্চিমে, সবাই এটিকে প্রমাণগ্রন্থ বলে স্বীকার করে নিলেন। পণ্ডিতেরা বলেন, বিজ্ঞানেশ্বর মুনি খ্রীস্টীয় এগারো শতাব্দীর শেষ-দিককার সময়ে এই পুঁথি লিখেছিলেন।

সকলেই স্বীকার করে নিলেন বটে, কিন্তু বাংলাদেশের লোক সবটা স্বীকার করলেন না। বাংলাদেশে বিজ্ঞানেশ্বরের মতো অত বড়ো পণ্ডিত না হোন, প্রায় তার কাছাকাছি যান এমন এক পণ্ডিত—জীমূতবাহন—তাঁর দায়ভাগ গ্রন্থ রচনা করে সমস্ত ভারতবর্ষের আইনের উপর কলম চালিয়ে গেছেন। বাংলাদেশে জীমূতবাহনের স্মৃতিরই চলন। তবে এ কথা বলে রাখতে হয় যে, যেখানে যেখানে দায়ভাগ কোনো-কিছু উচ্চবাচ্য করেন নি, সেখানে বাংলাদেশেও ঐ মিতাক্ষরার ব্যবস্থাই বলবৎ আছে। জীমূতবাহন যে একটু স্বাধীন প্রকৃতির লোক ছিলেন, সেটা তাঁর দায়ভাগতত্ত্বের উপসংহারের শ্লোক থেকেই বেশ বোঝা যায়:

নাচার্যগৌরবপরাহতদায়ভাগতত্ত্বপ্রবোধজনরঞ্জনমত্র শক্যম্।
কিন্তু প্রমাণপরতন্ত্রধিয়াং মুনীনাং সম্বাদমাত্রকৃতয়ে কৃতিনঃ প্রযত্নঃ॥

অর্থাৎ, যেসব ব্যক্তির বুদ্ধি প্রাচীন আচার্যদের প্রামাণ্য-গৌরবেই বিভ্রান্ত, আমার এই দায়ভাগতত্ত্ব তাঁদের মনোরঞ্জন করতে পারবে না; কিন্তু যাঁদের বুদ্ধি যুক্তিস্বরূপ প্রমাণের দ্বারা চালিত, বিভিন্ন মুনিদের মতের সমন্বয় করা এই গ্রন্থ তাঁদেরই নিমিত্ত সযত্নে রচিত হল।

বিবাহসম্বন্ধীয় আইনে জীমূতবাহন হাত চালান নি। তার কারণ, বিবাহসম্বন্ধে ভারতবর্ষের ভদ্রসমাজের সর্বত্র প্রায় একই রকমের ধারণা, তাই একই নিয়ম। ইতরবিশেষ যা-কিছু তা ঐ নিম্নস্তরের মধ্যেই দেখা যায়। কিন্তু দায়তত্ত্ব অর্থাৎ উত্তরাধিকার-বিষয়ক আইনে জীমূতবাহন সত্যিকার কেরামতি দেখিয়ে গেছেন। আর মেয়েদের যে নিজস্ব সম্পত্তি স্ত্রীধন, সেদিক দিয়েও জীমূতবাহন এক নতুন রাস্তা খুলে

দিয়ে গেছেন। পৈতৃক সম্পত্তি ভাগ-বণ্টন সম্বন্ধেও জীমূতবাহন অনেক নতুনত্বের আমদানি করেছেন। ঐসব বিষয়ে নতুন পন্থায় চলে বাংলাদেশ আর্যসংস্কারমুক্ত হয়ে নিজেকে অনেকটা স্বাধীনভাবে গড়ে তুলতে পেরেছিল। জীমূতবাহনকে খ্রীস্টীয় বারো শতাব্দীর গোড়াকার লোক বলে পণ্ডিতেরা অনুমান করেন।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে, মিতাক্ষরা এবং দায়ভাগ একালের দুটি প্রধান স্মৃতিগ্রন্থ, যাদের উপর বর্তমান সমস্ত হিন্দু আইনের নির্ভর। নিতান্ত দরকার না পড়লে লোকে আর প্রাচীন স্মৃতিগ্রন্থগুলো খুলেও দেখেন না, আগাগোড়া পড়েন আরো কম। বাংলাদেশ ছাড়া ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলে দেশভেদে কালভেদে ঐ মিতাক্ষরার উপরই ভর করে নানা শাখা— ইংরেজিতে যাকে বলে স্কুলস্ অভ্ ল— তাই গড়ে উঠেছিল। তাদের মূল এক হলেও শাখাপ্রশাখায় তফাত বেশ। প্রধান প্রধান শাখা হল— কাশী মিথিলা মহারাষ্ট্র ও দ্রাবিড়; এবং এদের সবাইকার থেকে বেশ একটু দূরে রয়েছে গৌড়দেশ।

মনু এবং যাজ্ঞবল্ক্য ছাড়া আরো সতেরো জন মুনির লেখা স্মৃতিগ্রন্থ চাক্ষুষ দেখতে পাওয়া যায়। আর ক'জনের শুধু নামই শোনা যায়। তাঁদের দু-পাঁচটা বচন খানকয়েক নিবন্ধগ্রন্থে উদ্ধৃত হতে দেখা গেলেও তাঁদের রচিত সমগ্র পুঁথিগুলি অনেকদিন হল লুপ্ত হয়ে গেছে। এ ছাড়া অসংখ্য টীকাকার, নিবন্ধকার, প্রবন্ধকার স্মৃতিশাস্ত্রের বিভিন্ন প্রস্তাব নিয়ে ভিন্ন ভিন্ন দিক থেকে অগুনতি পুঁথি লিখে, মূল স্মৃতিশাস্ত্রের কিছু-না-কিছু পরিবর্তন ঘটিয়েছেন। এই কাণ্ড চলেছিল ভারতবর্ষে ইংরেজ রাজত্ব ভালো করে গেড়ে বসবার আগে অবধি, অর্থাৎ উনিশ শো শতাব্দীর গোড়া পর্যন্ত।

ইংরেজি আমলে হিন্দু আইনের পরিবর্তন হয়েছে সবচেয়ে বেশি।

তবে সে অতি ধীরে ধীরে। কিন্তু সে পরিবর্তন স্মৃতিশাস্ত্রের একেবারে মূলে ঘা বসিয়েছে। হিন্দুবিবাহের আইনে প্রথম ধাক্কা মারলেন স্বয়ং বিদ্যাসাগর মহাশয়। তিনি দেখলেন, শাস্ত্রমতে বিধবাদের দুটি মাত্র গতি। এক, সহমরণ; আর-এক, ব্রহ্মচর্যপালন। সহমরণপ্রথা ইংরেজ রাজপুরুষরা এর পঁচিশ বছর আগেই আইন করে উঠিয়ে দিয়েছেন এবং ব্রহ্মচর্যে লোকের তেমন আর আস্থা নেই। সুতরাং তিনি বিধবাদের গতি করবার জন্যে ১৮৫৬ সালের ১৫ নম্বরের আইন পাস করিয়ে তারই বলে হিন্দুদের মধ্যে বিধবা বিবাহ বৈধ বলে স্বীকার করিয়ে নিলেন।

তবে বিদ্যাসাগরী আইনে যে বিধবারা বিবাহ করবেন বলে লোকেদের মনে ধারণা হয়েছিল, তাঁদের জন্যে বিদ্যাসাগরী পাড়ের শাড়ি পর্যন্ত তৈরি হয়ে যাওয়া সত্ত্বেও তাঁরা ঝাঁকে ঝাঁকে বিয়ে করতে ছুটে এলেন না। হিন্দু বিধবারা যে এদিকে তত ঝুঁকলেন না তার বোধ হয় আরো-একটা বিশেষ কারণ আছে। বিদ্যাসাগরী আইনে কোনো বিধবা পুনর্বার বিবাহ করলে পূর্ব স্বামীর সম্পত্তির উপর দাবি-দাওয়া ত্যাগ করতে বাধ্য হন। ধ্রুবকে পরিত্যাগ করে অধ্রুবের পিছনে ছোটা বুদ্ধির কাজ নয় বলেই তো শাস্ত্রে উপদেশ দেওয়া আছে।

তার পর এক জোর ধাক্কা মারলেন ব্রাহ্মসমাজের নেতা ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন। ব্রাহ্মরা জাত মানেন না। সুতরাং অসবর্ণ বিবাহে তাঁদের আপত্তি থাকার কথা নয়। কিন্তু ও বিষয়ে মস্ত বাধা ছিল ঐ সনাতন হিন্দু আইন। ও দিকে এমন আর কোনো আইন ছিল না যার বলে বৈধভাবে অসবর্ণ বিবাহ করা চলতে পারে। তাইতেই ১৮৭২ সালের তিন আইনের সৃষ্টি। বিবাহ ব্যাপারে সবর্ণ বিবাহ যে এতদিনের এক প্রকাণ্ড বাধা ছিল, সে বাধা দূর হয়ে গেল।

কিন্তু একটি বাধা তবু রয়ে গেল। সেটা সপিণ্ড বিবাহের বাধা।

তবে সেই সঙ্গে দুটো সম্পূর্ণ নতুন বিধির আমদানি হল, যে দুটো জিনিস হিন্দু আইনে ইতিপূর্বে কেউ কখনো দেখে নি বা শোনে নি। অর্থাৎ বিবাহ রেজিষ্ট্রি করা, এবং উপযুক্ত কারণে বিবাহবিচ্ছেদ ঘটানো। দুটোর কোনোটাই স্বদেশী মাল নয়, একেবারে খাঁটি বিলিতী বস্তু।

এখানে একটা কথা বলতে হয়। রেজেষ্ট্রি না করেই কতদিন ধরে যে হিন্দুবিবাহ চলে এসেছে তার সঠিক হিসেব কেউ দিতে পারে না। কিন্তু আদালতে বিশেষ কোনো-এক বিবাহ বৈধ কি অবৈধ তাই নিয়ে অনেকবার কথা উঠলেও, রেজিষ্ট্রি না-করা সত্ত্বেও বিবাহ সত্যি হয়েছে কি না-হয়েছে, সে প্রশ্ন বড়ো ওঠে নি। কেবল প্রথম লর্ড সিংহ মৃত হলে দ্বিতীয় লর্ড সিংহ যখন লর্ডদের সভায় আসন পাবার দাবি জানালেন তখন একবার প্রশ্ন উঠেছিল, তাঁর পিতার বিবাহ রেজিষ্ট্রি না হওয়ায় সেটা সিদ্ধ বিবাহ কি না। কিন্তু সে ও দেশে। এ দেশ হলে, ওই প্রশ্ন আদৌ উঠত কি না সন্দেহ।

এত সুবিধা করে দেওয়া সত্ত্বেও কিন্তু তিন আইনি বিবাহ বিরাট হিন্দু-সমাজ কিছুতেই গ্রহণ করল না। এর একটা কারণ এই মনে হয় যে, তিন আইন মতে বিবাহ করতে গেলে প্রথমেই অঙ্গীকার করে বসতে হয় যে, বিবাহ-ইচ্ছুক কোনো পক্ষই হিন্দু নন। নিতান্ত দায়ে না পড়লে কোন্ হিন্দু আর নিজেকে অহিন্দু বলে পরিচয় দিতে রাজি হবেন? না হওয়াই তো স্বাভাবিক।

এ ছাড়া আর-একটু কথা আছে। বর্ণবিভাগ ভারতবর্ষীয় লোকেদের এমনি মজ্জাগত যে, হিন্দু সমাজে মরেও অবধি জাত যায় না। সংস্কার এমনই যে, এক জাতের মড়াও অন্য জাতে ছুঁলে মৃতেরও সদ্গতি হয় না, আবার জীবিতদেরও স্নানাদি করে শুদ্ধ হয়ে নিতে হয়।

পুরাকালে দেখছি, এ বিষয়ে আরো কড়াক্কড়ি ছিল। বিভিন্ন বর্ণের

মৃতদেহও নগরের বিভিন্ন দ্বার দিয়ে বার করে তবে শ্মশানক্ষেত্রে নিয়ে যেতে হত। মনু বলেছেন :

দক্ষিণেন মৃতং শূদ্রং পুরদ্বারেণ নির্হরেৎ।
পশ্চিমোত্তরপূর্বৈস্তু যথাযোগং দ্বিজন্মনঃ॥

—মনুসংহিতা, ৫ অধ্যায়, ৯২ শ্লোক

শূদ্রের মৃতদেহ পুরীর দক্ষিণদ্বার দিয়ে, ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য এই দ্বিজাতিদের মৃতদেহ যথাক্রমে পশ্চিম উত্তর ও পূর্বদ্বার দিয়ে নির্গমন করাতে হবে।

সুতরাং এ দেশে ধর্মান্তর গ্রহণ করলেও বর্ণের প্রভাব এড়ানো যায় না। এই সংক্রান্ত একটা ঘটনা বলি। কলকাতায় সম্ভ্রান্ত কায়স্থবংশ উদ্ভূত এক প্রাচীন পরিবার আছেন। এই বংশের এক শাখা অনেক দিন আগেই খ্রীস্টান হয়ে যান। সেই শাখার একজন সেকালের কলকাতা কর্পোরেশনে আমার খুড়োমশায়ের সঙ্গে একত্র চাকরি করতেন। একদিন তিনি আমাদের বাড়ি এসে কাঁদ কাঁদ হয়ে খুড়ো-মহাশয়কে বললেন, শুনছেন রমণীবাবু, আমরা হলুম কায়স্থ খ্রীস্টান; আমার মেয়ে কি না তাঁতি খ্রীস্টানকে বিয়ে করার জন্যে জেদ ধরেছে। বলেই, ভদ্রলোক হাউ হাউ করে কেঁদে ফেললেন।

হিন্দুরা বিবাহক্ষেত্রে নিজেদের অহিন্দু বলে প্রচার করাটা কেমন যেন একটু কটু ঠেকছে মনে করে, ১৯২৩ সালে, সার্ হরিসিং গৌড় এক আইন পাস করালেন, সেটা ওই বছরের ৩০ নম্বরের আইন। এই আইন-মতে নিজেকে আর অহিন্দু বলে ঘোষণা না করেও অসবর্ণ বিবাহ করতে পারা যায়। কিন্তু একটা মজা হল। এই আইন অনুসারে যে হিন্দু বিবাহ করবেন, তিনি মৃত হলে কিন্তু তাঁর ত্যক্ত সম্পত্তি তাঁর উত্তরাধিকারীদের মধ্যে বণ্টন করা হবে খ্রীস্টানি আইন-মতে, অর্থাৎ

ইণ্ডিয়ান সাক্‌সেশন অ্যাক্ট অনুসারে। জ্যান্তে হিন্দু আর মরলে খ্রীস্টান, এ এক মন্দ কাণ্ড নয়।

এর পর এলেন রায়বাহাদুর হরবিলাস সারদা। তিনি আইনের অনেক সুখসুবিধা হিন্দুসমাজ স্বেচ্ছায় গ্রহণ করে নি ব'লে এখন থেকে হিন্দু বিবাহের সনাতনী আইনের উপর জোর জোর খাঁড়ার ঘা পড়তে লাগল। সারদাজী হিন্দুসমাজে বাল্যবিবাহ রোধ করার জন্য উঠে-পড়ে লাগলেন। ১৯২৯ সালে এক আইন পাস করালেন যাকে চলতি কথায় সারদা অ্যাক্ট বলা হয়। ১৯২৯ সালের ১৯ নম্বরের এই আইনে নির্দেশ দেওয়া হল যে, হিন্দু বিবাহে ছেলেদের উপযুক্ত বয়স কমপক্ষে আঠারো বছর, মেয়েদের জন্যে কমপক্ষে পনেরো বছর।

অবশ্য মনুর বিধান থাকা সত্ত্বেও হিন্দু ভদ্রসমাজে ধীরে ধীরে অল্প বয়সে বিবাহ দেওয়ার রীতি এমনিতেই উঠে গিয়েছিল। সেটা ঠিক নৈতিক কারণে নয়, অনেকটা অর্থনৈতিক কারণে। যা আছে, তা শুধু নিম্নশ্রেণীর সমাজে। কিন্তু এই আইন দিয়ে সেই সমাজকেও বাঁধা গেল না। কারণ এই আইনেই বিধান আছে যে, ধার্যকরা বয়সের চেয়ে কম বয়সে বিবাহ কোনোক্রমে একবার হয়ে বয়ে ঢুকে গেলে সে বিবাহ আর অসিদ্ধ বলে গণ্য হবে না। শুধু যাঁরা এ বিবাহ ঘটিয়েছেন তাঁদের একটা দণ্ড দিতে হবে। দণ্ডটি মোটের উপর লঘু দণ্ড। সেইজন্য ফলও বিশেষ কিছু হয় নি।

এর পর আইনকর্তারা অনেকদিন চুপচাপ বসেছিলেন। ১৯৪৬ সালে হঠাৎ উপরি উপরি হিন্দুবিবাহ-সম্বন্ধীয় দু-দুটো বড়ো রকমের আইন পাস করিয়ে দিলেন। ১৯৪৬ সালের ১৯ আর ২৮ নম্বরের আইনের কথাই বলছি। হিন্দু আইনে এত দিন স্ত্রীত্যাগের ব্যবস্থাই ছিল। ওই ১৯ নম্বরের আইনে এবারে স্বামী-ত্যাগেরও ব্যবস্থা দেওয়া হল।

স্থির হল, স্বামী যদি কুব্যাধিতে আক্রান্ত হন কি স্ত্রীকে ধরে মারেন কিংবা স্ত্রীকে যদি পরিত্যাগ করেন কিংবা এক স্ত্রী থাকতে আবার যদি বিবাহ করেন। যদি বসতবাড়িতেই রক্ষিতা নিয়ে এসে রাখেন কিংবা ব্যভিচারে লিপ্ত থাকেন কি ধর্মান্তর গ্রহণ ক'রে আর হিন্দু না থাকেন, তা হলে যে-কোনো হিন্দু স্ত্রী ওই আইনের বলে স্বচ্ছন্দে স্বামী ত্যাগ করে আলাদা বসবাস করতে পারবেন। ১৯৪৬ সালের ২৮ নম্বরের আইনের বলে হিন্দুবিবাহে সগোত্র ও সমানপ্রবর সংক্রান্ত যে দুটো প্রবল বাধা ছিল, তা উঠে গেল।

এর পর স্বাধীনতার ফলে, ১৯৪৯ সালের ২১ নম্বর আইনের দ্বারা জাতিগত বর্ণগত শ্রেণীগত সম্প্রদায়গত যত কিছু বাধা হিন্দুবিবাহে ছিল সব বাধাই একসঙ্গে দূর হয়ে গেল। এই আইনের প্রতাপে হিন্দু শিখ জৈন বৌদ্ধ বিনা বাধায় একে অপরকে বিবাহ করতে পারবেন। ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র বিভিন্ন বর্ণ আর রইল না, সবাই একবর্ণ হয়ে গেলেন। রাঢ়ী বারেন্দ্র দাক্ষিণাত্য বৈদিক পাশ্চাত্য বৈদিক প্রভৃতি যত রকম শ্রেণীর ব্রাহ্মণ, দক্ষিণরাঢ়ী উত্তররাঢ়ী বঙ্গজ কায়স্থ, পূর্বকুল দক্ষিণকুল পশ্চিমকুলের বৈদ্য, সুবর্ণবণিক গন্ধবণিক কংসবণিক শঙ্খবণিক তিলি তামলি গোপ সদ্‌গোপ চাষা ধোপা মাহিষ্য জেলে তাঁতি হাড়ি ডোম বাগ্‌দি বাউরি ইত্যাদি কারো সঙ্গে কারো কোনো প্রভেদ রইল না। সকলেই করণকারণের যোগ্য বলে স্থির হয়ে গেল। আর্যসমাজী ব্রাহ্মসমাজী প্রার্থনাসমাজী বীরশৈব লিঙ্গায়েত শাক্ত বৈষ্ণব যে যেখানে ছিলেন, বিবাহের বেলায় সকলেই এক হয়ে গেলেন।

সকলেই মনে করেছিলেন, হিন্দু কোডেই আইনকর্তারা ছোটোখাটো অস্ত্র ছেড়ে, একেবারে কামান দাগবেন, হিন্দু বিবাহ আইনের আমূল পরিবর্তন করবেন। তাই সেই দিকেই সকলের দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল।

ইতিমধ্যে কোন্ ফাঁকে যে এই আইনটা পাস হয়ে গেল কেউ তা ধরতেই পারলেন না, এই নিয়ে লোকের মধ্যে কোনো আলাপ-আলোচনাই হল না।

পর পর এতগুলো আইনের কথা শুনতে শুনতে হয়তো আপনাদের বিভ্রম লেগে যেতে পারে। অসহিষ্ণু হয়ে বলতেও পারেন, তা হলে সনাতন হিন্দুবিবাহের আইনের বাকি রইল কি? বাকি কিছু রইল বৈ কি। আসলে হিন্দুবিবাহে বিচ্ছেদ ঘটানোর কথাটা তখনো পর্যন্ত শুধু মুখেমুখেই ছিল, কাগজে-কলমে তেমন কিছু দাঁড়ায় নি। সনাতনীদের মনে মনে ভরসা ছিল, আইনকর্তারা বোধ হয় শেষপর্যন্ত হিন্দু স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদটা অন্তত কিছুতেই ঘটতে দেবেন না। কিন্তু তাঁদের সে আশা টিকল না।

কিন্তু গোড়াতেই একেবারে হিন্দুবিবাহে বিচ্ছেদের কথাটা না তুলে আইনকর্তারা ১৯৫৪ সালের ৯ অক্টোবর তারিখে ৪৩ নম্বরের আইন, যার ইংরেজি নাম স্পেশ্যাল ম্যারেজ আক্ট, তাই পাস করলেন। এটা আর কিছুই নয়, সেই কেশব সেনের পুরনো তিন আইন আর হরিসিং গৌড়ের ১৯২৩ সালের ৩০ নম্বর আইনকে মিলিয়ে-মিশিয়ে তাকে নতুন পোশাক পরিয়ে খানিক মাজাঘষা করে নিয়ে সকলের সামনে খুলে ধরা হল।

স্পেশ্যাল ম্যারেজ অ্যাক্টে পূর্বের সেই তিন আইনের ডিভোর্সের ব্যাপারটাকে খানিক সাফসুতরো করে আরো পরিষ্কার করা হয়েছে। সঙ্গেসঙ্গে আর-একটা বিলিতী ব্যবস্থা এর মধ্যে ঢুকে গেল। সেটা হচ্ছে জুডিশিয়ল সেপারেশন অর্থাৎ আধা-বিচ্ছেদের ব্যবস্থা। যেসব কারণে পুরো-বিচ্ছেদ অর্থাৎ ডিভোর্স চলতে পারে, প্রায় ঠিক সেই সব কারণেই আধা-বিচ্ছেদ ঘটিয়ে, স্বামী-স্ত্রী আইন মতোবেক আলাদা হয়ে থাকতে

পারেন। বিবাহের বয়সটাও একটু বাড়িয়ে দেওয়া হল। এই আইনে বিবাহের উপযুক্ত বয়স পুরুষের জন্যে কমপক্ষে একুশ বছর, মেয়েদের জন্যে কমপক্ষে আঠারো বছর ধার্য করা হয়েছে। এটা অবশ্য স্পেশাল ম্যারেজের রীতি, জেনারল হিন্দু ম্যারেজের নয়।

এই বার হিন্দুবিবাহের সব শেষের যে আইন সেইটে প্রকাশ হল। দেখা গেল, হিন্দু কোড নামটা পরিত্যক্ত হয়েছে। হিন্দু কোডের খসড়ায় হিন্দু আইনের সবই নতুন নতুন পরিকল্পনা একই সঙ্গে এক জায়গায় থাকবে কথা ছিল; কিন্তু আইনকর্তারা এবার স্থির করলেন, সেগুলো দফায় দফায় ছাড়া হবে। হিন্দুবিবাহ-সংক্রান্ত বিষয়টি ১৯৫৫ সালের ২৫ নম্বরের আইন হয়ে, হিন্দু ম্যারেজ অ্যাক্ট নাম নিয়ে ছাপার অক্ষরে আত্মপ্রকাশ করল। মহামান্য রাষ্ট্রপতিমহোদয় ১৯৫৫ সালের ১৮ই মে তারিখে এই আইনে তাঁর সম্মতি জানিয়ে দিয়ে সেটিকে সারা ভারতবর্ষময় চালু করে দিলেন।

হিন্দু ম্যারেজ অ্যাক্ট প্রকাশ হতে দেখা গেল যে, আইনকর্তারা এই আইনে সকলের জন্য একই প্রকারের একটা নিয়ম না করে, সকলকে খুশি করার জন্য দু-নৌকায় পা দিয়ে চলবার চেষ্টা করেছেন। হিন্দু জাতির পর্যায় থেকে মুসলমান খ্রীস্টান পার্শী ইহুদীকে বাদ দিয়েছেন, কিন্তু বৌদ্ধ জৈন ও শিখদের ওই পর্যায়ে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে; অসপিণ্ড বিবাহ বজায় রেখেছেন, কিন্তু অসবর্ণ বিবাহকে অবৈধ বিবাহ থেকে বর্জন করেছেন। সঙ্গে সঙ্গে অতি নিকট আত্মীয়দের মধ্যে যেসব বিবাহ আছে তাদের প্রোহিবিটেড ডিগ্রির বিবাহ নাম দিয়ে অসিদ্ধ বিবাহের মধ্যে ফেলেছেন। তবে এও বলেছেন, পাত্রপাত্রী যে সমাজের লোক সেই সমাজে যদি চিরাচরিত কুলপ্রথা মতো নিকট-আত্মীয়-বিবাহ চলে, তা হলে অন্য কথা। বিবাহে

শাস্ত্রীয় আচারের একটা বিকল্প ব্যবস্থা রেখে তার মধ্যে সপ্তপদীগমনকে প্রধান আচার বলে স্বীকার করেছেন, আবার সেই সঙ্গে বিবাহ রেজিস্ট্রি করারও একটা বন্দোবস্ত রেখে দিয়েছেন। তবে রেজিস্ট্রি করার নিয়মকানুনগুলো যে কি হবে তা খুলে বলেন নি, তার ভার প্রদেশ সরকারের উপর ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়েছেন।

বিবাহে অভিভাবকদের ফর্দটা অনেকটা সনাতনী হিন্দু আইনের মতোই রেখেছেন, তবে সেখানে মেয়েদের আসন খুবই উঁচুতে উঠিয়েছেন। এই আইনমতে অভিভাবকদের ক্রমে মা আসেন ঠিক বাপের পরেই, ঠাকুরমা আসেন ঠাকুরদার পিছন-পিছনই।

আইনকর্তারা এই আইনে সনাতনী হিন্দু আইনের সঙ্গে সবচেয়ে বড়ো তফাত করেছেন, পুরুষদের পক্ষে এক স্ত্রী থাকতে অন্য আর স্ত্রী গ্রহণ ও মেয়েদের পক্ষেও একসঙ্গে বহু পতি গ্রহণ উভয়কেই স্পষ্টভাবে অবৈধ করে দিয়ে।

বিবাহের বয়স পুরুষদের জন্যে কমপক্ষে আঠারো বছর ও মেয়েদের জন্যে পনেরো বছর ধার্য করেছেন। তবে যেখানে মেয়ের বয়স আঠারো বছর পার হয় নি সেখানে কন্যার অভিভাবকের মত নিয়ে তবে বিবাহ করা চলতে পারবে।

আরো-একটা নতুন ব্যবস্থা দেওয়া হয়েছে, পাগলা ও জড়বুদ্ধির বিবাহ একেবারে বন্ধ করে দিয়ে।

আসলে যে দুটো জিনিস সনাতন হিন্দু আইনে এবং সনাতন হিন্দু-সমাজের একেবারেই বিপরীত, অর্থাৎ বিবাহবিচ্ছেদ ও তারই আনুষঙ্গিক আধা-বিচ্ছেদ, ডিভোর্স আর জুডিশিয়ল সেপারেশন, সে দুটোকে এই অ্যাক্টে বলবৎ রাখা হয়েছে।

এখন বিবাহবিচ্ছেদের কথা বলি। হিন্দু ম্যারেজ অ্যাক্ট অনুসারে

অবৈধ বিবাহ, যথা স্ত্রী কি স্বামী বর্তমানে অন্য বিবাহ, কি নিষিদ্ধ নিকট-আত্মীয় বিবাহ—এসবের বেলায় কোনো অসুবিধা নেই। কারণ এসব বিবাহ তো গোড়া থেকেই অসিদ্ধ বলে ধরে নেওয়া হয়েছে। প্রয়োজন হলে, আদালত থেকে এগুলোকে আদৌ বিবাহ হয় নি বলে ঘোষণা করিয়ে নিতে কিছুমাত্র বেগ পেতে হবে না। তবে এখানে একটা মস্ত সুব্যবস্থা আইনকর্তারা করে দিয়েছেন যে, এসব বিবাহের ফলে যেসব সন্তান হয়েছে তারা কিন্তু বৈধ সন্তান বলেই সমাজে চলে যাবে।

কিন্তু সিদ্ধ বিবাহকে ছেদন করতে গেলে কতকগুলো বিশেষ বিশেষ কারণ দর্শাতে হবে, এমনি এমনি কিছু হবে না। তবে বিবাহবিচ্ছেদ সম্বন্ধে আইনকর্তারা দোমনা হন নি। অর্থাৎ, শাস্ত্রীয় ও লৌকিক যে ভাবেই হিন্দু বিবাহ সম্পন্ন হোক-না কেন, উপযুক্ত কারণ দেখাতে পারলে, দুই রকমের বিবাহই এক রকমেই বিচ্ছিন্ন করা যেতে পারবে।

কারণগুলি এই—

১ স্বামী বা স্ত্রী কেউ যদি ব্যভিচারে লিপ্ত হন ;

২ উভয়পক্ষের কেউ যদি ধর্মান্তর গ্রহণের ফলে আর হিন্দু না থাকেন ;

৩ বিবাহভঙ্গ প্রার্থনা করে আদালতে দরখাস্ত দেবার পূর্বে ক্রমান্বয়ে তিন বছর ধরে স্বামী কিংবা স্ত্রী কেউ যদি বিকৃতমস্তিষ্ক থেকে থাকেন, আর তা সারানো যদি চিকিৎসার অসাধ্য হয় ;

৪ ওই রকম তিন বছর ধরে যদি স্বামী বা স্ত্রী চিকিৎসার অসাধ্য মহাকুষ্ঠব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে থাকেন ;

৫ ওই রকম তিন বছর ধরে স্বামী কিংবা স্ত্রী ছোঁয়াচে যৌনব্যাধিতে আক্রান্ত থাকেন ;

৬ স্বামী-স্ত্রীর কেউ যদি সন্ন্যাস গ্রহণ করে সংসারত্যাগ করেন ;

৭ যদি কোনো পক্ষ ক্রমান্বয়ে সাত বছর ধরে নিরুদ্দিষ্ট থাকেন ;

৮ যেখানে আধা-বিচ্ছেদ অর্থাৎ জুডিশিয়ল সেপারেশনের ডিক্রি দেওয়ার পরও, উভয়পক্ষ দু বছর আর স্বামী-স্ত্রীরূপে সহবাস না করেন ;

৯ যেখানে আদালত থেকে সহবাস করার অর্থাৎ রেস্‌টিটিউশন অভ্‌ কন্‌জুগাল্‌ রাইটস্‌-এর ডিক্রি দেবার পরও, কোনো এক পক্ষ সেই ডিক্রি অমান্য করে অপর পক্ষের কাছ থেকে টানা দু বছর তফাতে বসে থাকেন ;

বিবাহবিচ্ছেদের এই নয় কারণ। মোটামুটি এইসব কারণে আধা-বিচ্ছেদ অর্থাৎ জুডিশিয়ল সেপারেশনও ঘটাতে পারা যায়।

এ ছাড়া, হিন্দু ম্যারেজ অ্যাক্ট পাস হবার পূর্বে যেসব বিবাহ ঘটে গেছে, সেসব ক্ষেত্রেও যদি প্রকাশ পায় যে, স্বামী এক স্ত্রী বর্তমানে অন্য স্ত্রী গ্রহণ করেছেন, তা হলে দ্বিতীয় স্ত্রী তখনই বিবাহবিচ্ছেদের মামলা আনতে পারেন। তবে মামলা আনবার পূর্বেই যদি প্রথম স্ত্রী গত হন, তা হলে তো আর কথা নেই। ওইখানেই ব্যাপারটা চুকে গেল। কারণ, তখন দ্বিতীয় স্ত্রী তো একাই একেশ্বরী রইলেন।

নতুন খেলনা হাতে পেলে শিশুরা যেমন সেটিকে তখনই ভাঙতে উদ্যত হয়, নতুন আইনের ফলে সে রকম কোনো কিছু যাতে না ঘটে, সেজন্য আইনকর্তারা বুদ্ধি করে সতর্ক হয়ে এই বিধান দিয়েছেন যে, সাধারণতঃ বিবাহের তারিখ থেকে তিন বছরের পূর্বে আদালত কোনো বিবাহবিচ্ছেদের দরখাস্ত গ্রহণ করবেন না। আর, বিবাহবিচ্ছেদ হয়ে যাবার পর কারো পুনর্বার বিবাহ করতে ইচ্ছে হলে তাঁকে অন্ততপক্ষে একটা বছর অপেক্ষা করে থাকতে হবে।

আরো-একটা ব্যবস্থার কথা বলতে হয়। ডিভোর্স হয়ে গেলে,

আদালত ইচ্ছে করলে স্বামীকে স্ত্রীর কিংবা স্ত্রীকে স্বামীর পরস্পরের জীবদ্দশা পর্যন্ত উপযুক্ত খোরপোষ দেবার হুকুম দিতে পারেন। অবশ্য কোনো পক্ষ যদি ইতিমধ্যে আবার বিবাহ করে বসেন, তা হলে আর দিতে হবে না। আবার যদি কোনো পক্ষ একেবারে নিঃস্ব হন তা হলে তো আর কোনো কথা নেই।

ডিভোর্স কি জুডিশিয়ল সেপারেশনের ডিক্রি পেতে হলে, কি কি কার্যবিধি অবলম্বন করতে হবে, সে সম্বন্ধে আমি কিছুই উল্লেখ করলুম না। সে আপনারা অ্যাক্ট খুলে সহজেই দেখে নিতে পারবেন, কিংবা এ বিষয়ে উকীল-কৌঁসুলির পরামর্শ নিতে পারবেন।

হিন্দু বিবাহের আইন সম্বন্ধের কথা এইখানেই শেষ। আমার বোধ হয়, এখনই আর-কিছু বলতেও হবে না। কারণ, এর পর যদি আইন করে অন্য কোনো ব্যবস্থা করতে হয়, তা হলে বিবাহব্যাপারটাকেই একেবারে তুলে দেওয়া ছাড়া আর কিছু করবার নেই। সেটা ভরসা করি, শীঘ্রই ঘটে উঠবে না।

বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ

॥ ১৩৫০ বৈশাখ হইতে নিয়মিত প্রকাশিত হইতেছে ॥

প্রতি গ্রন্থ আট আনা

১। সাহিত্যের স্বরূপ ॥ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। চতুর্থ মুদ্রণ
২। কুটিরশিল্প ॥ শ্রীরাজশেখর বসু। চতুর্থ মুদ্রণ
৩। ভারতের সংস্কৃতি ॥ শ্রীক্ষিতিমোহন সেন শাস্ত্রী। চতুর্থ মুদ্রণ
*৪। বাংলার ব্রত ॥ অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর। তৃতীয় মুদ্রণ
*৫। জগদীশচন্দ্রের আবিষ্কার ॥ শ্রীচারুচন্দ্র ভট্টাচার্য। তৃতীয় মুদ্রণ
৬। মায়াবাদ ॥ মহামহোপাধ্যায় প্রমথনাথ তর্কভূষণ। তৃতীয় মুদ্রণ
৭। ভারতের খনিজ ॥ শ্রীরাজশেখর বসু। তৃতীয় মুদ্রণ
*৮। বিশ্বের উপাদান ॥ শ্রীচারুচন্দ্র ভট্টাচার্য। তৃতীয় মুদ্রণ
৯। হিন্দু রসায়নী বিদ্যা ॥ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়। দ্বিতীয় মুদ্রণ
*১০। নক্ষত্র-পরিচয় ॥ শ্রীপ্রমথনাথ সেনগুপ্ত। তৃতীয় মুদ্রণ
*১১। শারীরবৃত্ত ॥ ডক্টর রুদ্রেন্দ্রকুমার পাল। তৃতীয় মুদ্রণ
১২। প্রাচীন বাংলা ও বাঙালী ॥ ডক্টর সুকুমার সেন। দ্বিতীয় মুদ্রণ
*১৩। বিজ্ঞান ও বিশ্বজগৎ ॥ শ্রীপ্রিয়দারঞ্জন রায়। তৃতীয় মুদ্রণ
১৪। আয়ুর্বেদ-পরিচয় ॥ মহামহোপাধ্যায় গণনাথ সেন। দ্বিতীয় মুদ্রণ
১৫। বঙ্গীয় নাট্যশালা ॥ ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। তৃতীয় মুদ্রণ
*১৬। রঞ্জনদ্রব্য ॥ ডক্টর দুঃখহরণ চক্রবর্তী। দ্বিতীয় মুদ্রণ
১৭। জমি ও চাষ ॥ ডক্টর সত্যপ্রসাদ রায়চৌধুরী। দ্বিতীয় মুদ্রণ
১৮। যুদ্ধোত্তর বাংলার কৃষি ও শিল্প ॥ ডক্টর কুদরত-এ-খুদা। দ্বিতীয় মুদ্রণ
১৯। রায়তের কথা ॥ প্রমথ চৌধুরী। দ্বিতীয় মুদ্রণ
২০। জমির মালিক ॥ শ্রীঅতুলচন্দ্র গুপ্ত
২১। বাংলার চাষী ॥ শ্রীশান্তিপ্রিয় বসু। দ্বিতীয় মুদ্রণ
২২। বাংলার রায়ত ও জমিদার ॥ ডক্টর শচীন সেন। দ্বিতীয় মুদ্রণ
২৩। আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা ॥ শ্রীঅনাথনাথ বসু। তৃতীয় মুদ্রণ
২৪। দর্শনের রূপ ও অভিব্যক্তি ॥ শ্রীউমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য। দ্বিতীয় মুদ্রণ
২৫। বেদান্ত-দর্শন ॥ ডক্টর রমা চৌধুরী। দ্বিতীয় মুদ্রণ
২৬। যোগ-পরিচয় ॥ ডক্টর মহেন্দ্রনাথ সরকার। দ্বিতীয় মুদ্রণ

* সচিত্র

২৭। রসায়নের ব্যবহার ॥ ডক্টর সর্বাণীসহায় গুহসরকার। দ্বিতীয় মুদ্রণ

*২৮। রমনের আবিষ্কার ॥ ডক্টর জগন্নাথ গুপ্ত। দ্বিতীয় মুদ্রণ

*২৯। ভারতের বনজ ॥ শ্রীসত্যেন্দ্রকুমার বসু। দ্বিতীয় মুদ্রণ

৩০। ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক ইতিহাস ॥ রমেশচন্দ্র দত্ত

৩১। ধনবিজ্ঞান ॥ শ্রীভবতোষ দত্ত। দ্বিতীয় মুদ্রণ

*৩২। শিল্পকথা ॥ শ্রীনন্দলাল বসু। দ্বিতীয় মুদ্রণ

৩৩। বাংলা সাময়িক সাহিত্য ॥ ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

৩৪। মেগাস্থেনীসের ভারত-বিবরণ ॥ শ্রীরজনীকান্ত গুহ

*৩৫। বেতার ॥ ডক্টর সতীশরঞ্জন খাস্তগীর। দ্বিতীয় মুদ্রণ

৩৬। আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ॥ শ্রীবিমলচন্দ্র সিংহ

৩৭। হিন্দু সংগীত ॥ প্রমথ চৌধুরী ও শ্রীইন্দিরা দেবী

৩৮। প্রাচীন ভারতের সংগীত-চিন্তা ॥ শ্রীঅমিয়নাথ সান্যাল

৩৯। কীর্তন ॥ অধ্যাপক শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র

*৪০। বিশ্বের ইতিকথা ॥ শ্রীসুশোভন দত্ত

৪১। ভারতীয় সাধনার ঐক্য ॥ ডক্টর শশিভূষণ দাশগুপ্ত। দ্বিতীয় মুদ্রণ

৪২। বাংলার সাধনা ॥ শ্রীক্ষিতিমোহন সেন শাস্ত্রী। দ্বিতীয় মুদ্রণ

৪৩। বাঙালী হিন্দুর বর্ণভেদ ॥ ডক্টর নীহাররঞ্জন রায়

৪৪। মধ্যযুগের বাংলা ও বাঙালী ॥ ডক্টর সুকুমার সেন

৪৫। নব্যবিজ্ঞানে অনির্দেশ্যবাদ ॥ শ্রীপ্রমথনাথ সেনগুপ্ত

*৪৬। প্রাচীন ভারতের নাট্যকলা ॥ ডক্টর মনোমোহন ঘোষ

৪৭। সংস্কৃত সাহিত্যের কথা ॥ নিত্যানন্দবিনোদ গোস্বামী

৪৮। অভিব্যক্তি ॥ শ্রীরথীন্দ্রনাথ ঠাকুর

*৪৯। হিন্দু জ্যোতির্বিদ্যা ॥ ডক্টর সুকুমাররঞ্জন দাশ

৫০। ন্যায়দর্শন ॥ শ্রীসুখময় ভট্টাচার্য সপ্ততীর্থ শাস্ত্রী

৫১। আমাদের অদৃশ্য শত্রু ॥ ডক্টর ধীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

৫২। গ্রীক দর্শন ॥ শ্রীশুভব্রত রায় চৌধুরী

৫৩। আধুনিক চীন ॥ থান য়ুন শান

৫৪। প্রাচীন বাংলার গৌরব ॥ মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী

*৫৫। নভোরশ্মি ॥ ডক্টর সুকুমারচন্দ্র সরকার

৫৬। আধুনিক য়ুরোপীয় দর্শন ॥ শ্রীদেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

*৫৭। ভারতের বনৌষধি ॥ ডক্টর অসীমা চট্টোপাধ্যায়

৫৮। উপনিষদ্ ॥ মহামহোপাধ্যায় শ্রীবিধুশেখর শাস্ত্রী

৫৯। শিশুর মন ॥ ডক্টর সুখেনলাল ব্রহ্মচারী। দ্বিতীয় মুদ্রণ

৬০। প্রাচীন ভারতে উদ্ভিদ্‌বিদ্যা ॥ ডক্টর গিরিজাপ্রসন্ন মজুমদার

৬১। ভারতশিল্পের ষড়ঙ্গ ॥ অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

*৬২। ভারতশিল্পে মূর্তি ॥ অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

* সচিত্র

*৬৩। বাংলার নদনদী ॥ ডক্টর নীহাররঞ্জন রায়
৬৪। ভারতের অধ্যাত্মবাদ ॥ ডক্টর নলিনীকান্ত ব্রহ্ম
৬৫। টাকার বাজার ॥ শ্রীঅতুল সুর
৬৬। হিন্দু সংস্কৃতির স্বরূপ ॥ শ্রীক্ষিতিমোহন সেন শাস্ত্রী
৬৭। শিক্ষাপ্রকল্প ॥ শ্রীযোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি
৬৮। ভারতের রাসায়নিক শিল্প ॥ ডক্টর হরগোপাল বিশ্বাস
*৬৯। দামোদর পরিকল্পনা ॥ ডক্টর চন্দ্রশেখর ঘোষ
৭০। সাহিত্য-মীমাংসা ॥ শ্রীবিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য
*৭১। দূরেক্ষণ ॥ শ্রীজিতেন্দ্রচন্দ্র মুখোপাধ্যায়
৭২। তেল আর ঘি ॥ শ্রীরামগোপাল চট্টোপাধ্যায়
৭৩। প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যে হিন্দু-মুসলমান ॥ প্রমথ চৌধুরী
৭৪। ভারতে হিন্দু-মুসলমানের যুক্ত সাধনা ॥ শ্রীক্ষিতিমোহন সেন শাস্ত্রী
৭৫। বিভক্ত ভারত ॥ শ্রীবিনয়েন্দ্রমোহন চৌধুরী
৭৬। বাংলার জনশিক্ষা ॥ শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল
*৭৭। সৌরজগৎ ॥ ডক্টর নিখিলরঞ্জন সেন
*৭৮। প্রাচীন বাংলার দৈনন্দিন জীবন ॥ ডক্টর নীহাররঞ্জন রায়
৭৯। ভারত ও মধ্য এশিয়া ॥ ডক্টর প্রবোধচন্দ্র বাগচী
৮০। ভারত ও ইন্দোচীন ॥ ডক্টর প্রবোধচন্দ্র বাগচী
৮১। ভারত ও চীন ॥ ডক্টর প্রবোধচন্দ্র বাগচী
৮২। বৈদিক দেবতা ॥ শ্রীবিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য
*৮৩। বঙ্গসাহিত্যে নারী ॥ ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
*৮৪। সাময়িকপত্র সম্পাদনে বঙ্গনারী ॥ ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
*৮৫। বাংলার স্ত্রীশিক্ষা ॥ শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল
৮৬। গণিতের রাজ্য ॥ ডক্টর গগনবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায়
*৮৭। রসাঞ্জন ॥ ডক্টর রামগোপাল চট্টোপাধ্যায়
৮৮। নাথপন্থ ॥ ডক্টর কল্যাণী মল্লিক
৮৯। সরল ন্যায় ॥ শ্রীঅমরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য
৯০। খাদ্য-বিশ্লেষণ ॥ ডক্টর বীরেশচন্দ্র গুহ ও শ্রীকালীচরণ সাহা
৯১। ওড়িয়া সাহিত্য ॥ শ্রীপ্রিয়রঞ্জন সেন
৯২। অসমীয়া সাহিত্য ॥ শ্রীসুধাংশুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়
৯৩। জৈনধর্ম ॥ শ্রীঅমূল্যচন্দ্র সেন
৯৪। ভাইটামিন ॥ ডক্টর রুদ্রেন্দ্রকুমার পাল
৯৫। মনস্তত্ত্বের গোড়ার কথা ॥ শ্রীসমীরণ চট্টোপাধ্যায়
৯৬। বাংলার পালপার্বণ ॥ শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্তী
*৯৭। জাভা ও বলির নৃত্যগীত ॥ শ্রীশান্তিদেব ঘোষ
৯৮। বৌদ্ধধর্ম ও সাহিত্য ॥ ডক্টর প্রবোধচন্দ্র বাগচী

* সচিত্র

৯৯। ধম্মপদ-পরিচয় ॥ শ্রীপ্রবোধচন্দ্র সেন
১০০। সমবায়নীতি ॥ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
১০১। ধনুর্বেদ ॥ শ্রীযোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি
*১০২। সিংহলের শিল্প ও সভ্যতা ॥ শ্রীমণীন্দ্রভূষণ গুপ্ত
১০৩। তন্ত্রকথা ॥ শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্তী
১০৪। বাংলার উচ্চশিক্ষা ॥ শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল
*১০৫। কুইনিন ॥ শ্রীরামগোপাল চট্টোপাধ্যায়
১০৬। গ্রন্থাগার ॥ শ্রীবিমলকুমার দত্ত
১০৭। বৈশেষিক দর্শন ॥ শ্রীসুখময় ভট্টাচার্য সপ্ততীর্থ শাস্ত্রী
১০৮। সৌন্দর্যদর্শন ॥ শ্রীপ্রবাসজীবন চৌধুরী
১০৯। পোর্সিলেন ॥ শ্রীহীরেন্দ্রনাথ বসু
১১০। কয়লা ॥ শ্রীগৌরগোপাল সরকার
*১১১। পেট্রোলিয়ম ॥ শ্রীমৃত্যুঞ্জয়প্রসাদ গুহ
১১২। জাতীয় আন্দোলনে বঙ্গনারী ॥ শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল
১১৩। বাংলা লিরিকের গোড়ার কথা ॥ শ্রীতপনমোহন চট্টোপাধ্যায়
*১১৪। ডাকের কাহিনী ॥ শ্রীনরেন্দ্রনাথ রায়
*১১৫। হীরকের কথা ॥ শ্রীঅমিয়কুমার দত্ত
১১৬। পশ্চিমবঙ্গের জনবিন্যাস ॥ শ্রীবিমলচন্দ্র সিংহ
১১৭। নবযুগের ধাতুচতুষ্টয় ॥ ডক্টর জগন্নাথ গুপ্ত
১১৮। হিন্দু আইনে বিবাহ ॥ শ্রীতপনমোহন চট্টোপাধ্যায়

* সচিত্র

লোকশিক্ষা গ্রন্থমালা

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	
বিশ্বপরিচয়	১৷৷০
ইতিহাস	২৷৷০, ৩৲
সুরেন ঠাকুর	
বিশ্বমানবের লক্ষ্মীলাভ	২।০
শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়	
ভারতের ভাষা ও ভাষাসমস্যা	২।০
শ্রীপ্রমথনাথ সেনগুপ্ত	
পৃথ্বীপরিচয়	১।০
শ্রীরথীন্দ্রনাথ ঠাকুর	
প্রাণতত্ত্ব	২।০
শ্রীপশুপতি ভট্টাচার্য	
আহার ও আহার্য	১।০
শ্রীনিত্যানন্দবিনোদ গোস্বামী	
বাংলা সাহিত্যের কথা	১৷৷০
শ্রীশ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়	
বাংলা উপন্যাস	২৲
শ্রীউমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য	
ভারত-দর্শনসার	৩।০
শ্রীচারুচন্দ্র ভট্টাচার্য	
ব্যাধির পরাজয়	১৷৷০
পদার্থবিদ্যার নবযুগ	৩৲
শ্রীনির্মলকুমার বসু	
হিন্দুসমাজের গড়ন	২৷৷০
শ্রীসত্যেন্দ্রকুমার বসু	
হিউএনচাঙ	২৷৷০, ৩৲
শ্রীযোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি	
পূজা-পার্বণ	৩৲, ৪৲